সম্পূর্ণ গোয়েন্দা উপন্যাস

কালো ঘোড়ার ক্লু

অদ্রীশ বর্ধন

॥ ১ ॥
নদীর পাড়ে মাছের গুদোম

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল অবিচল। এতটা পথ একটানা স্কুটার চালিয়ে আসা কম নয়। হাড়ে হাড়ে ঝাঁকুনি লেগেছে। প্রতিটি স্নায়ু থিরথির করে কেঁপেছে। মাথায় হাওয়া লাগাবে বলে খুলে রেখেছে হেলমেট। চুল উড়ছে। হিপিদের মতন লম্বা লম্বা চুল, রোদেঝলা মুখ, খোঁচা দাড়ি, কুঁচকোনো চোখ, আর মাথা ঘিরে লম্বা চুলের লটপটানি ওর স্বাভাবিক বন্য চেহারাকে আরও উদ্দাম, আরও বন্য করে তুলেছে।

বন্য ও ছেলেবেলা থেকেই। ওর নাম অবিচল বাগ। লোকে শুধু বাঘ বলে ডাকে। বাঘের মতন স্বভাব নয়, তবুও বাঘ নামটাই ডাক নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু একটা কারণে। ওর চোখ।

অবিচলের চোখ দুটো যেন সুন্দরবনের বাঘের কাছ থেকে ধার করা। পিঙ্গল বর্ণ। এমনিতে শান্ত। কিন্তু রেগে গেলেই চোখের

ভেতরে বুঝি আগুন জ্বলতে থাকে। ভয়ানক সেই চাহনির সামনে কুঁচকে যায় ডানপিটে মস্তানরাও।

তবে এহেন চাহনি কালেভদ্রে প্রকাশ পায় অবিচলের এই দুটি প্রত্যঙ্গে। দ্বিতীয় রিপুকে বশে রেখেছে বলেই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে ব্যক্তিত্বকে। ওর কথা বলা, হাঁটা চলা, এমনকি তাকানোর মধ্যেও ছিটকে ছিটকে বেরোয় অন্তরের তেজ। তেজী পুরুষকে সবাই সমীহ করে। অবিচলের মূলধন এই তেজ।

পেশায় ও মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। বড় বড় কোম্পানির দাসানুদাস হওয়ার প্রবৃত্তি ওর মধ্যে নেই। কারও পায়ের তলায় বসে চাকরি করা ওর কোষ্ঠীতে লেখেনি। তাই বেছে নিয়েছে ছোট্ট একটা কোম্পানি। খাঁটি বাঙালি কোম্পানি। সেখানে ও সেলস ডিপার্টমেন্টের সর্বেসর্বা। নামে রিপ্রেজে-ন্টেটিভ—আসলে মার্কেটিং ম্যানেজার। এটা ওর মার্কেটিং টেকনিক। ছোট ছোট ওষুধের দোকান আর ডাক্তারদের কাছে দেখায় ওর মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ-এর কার্ড, বেশি সহানুভূতি পাওয়ার জন্য। আড্ডা জমে ভাল। কিন্তু যেখানে চেয়ারের গরিমা দেখানোর দরকার হয়, সেখানে বের করে মার্কেটিং ম্যানেজারের কার্ড।

ধূর্ত ও বরাবরই। এই কাহিনীও রচিত হলো শুধু ওর ধূর্ততার জন্যেই। ওর বাঘ চোখ যদি সেদিন নাম্বার প্লেটের হেঁয়ালি নজরে না আনত, তাহলে বিরাট এই প্রতারণা ধরা পড়ত না। এতগুলো মানুষও খুন হয়ে যেত না। প্রথমে অ্যামেচার ডিটেকটিভগিরি করেছে। রহস্য ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে দেখে প্রফেশন্যাল ডিটেকটিভের শরণ নিয়েছে। আসরে আবির্ভূত হয়েছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

কিন্তু অবিচলের চোখ—ওর সেই বিখ্যাত বাঘ-চোখ যদি সংখ্যার গোলমাল খুঁটিয়ে না দেখত, যদি তাই নিয়ে নিজের ধূর্ত মগজকে এনগেজ করে না রাখত, তাহলে কোনও দিনই ফাঁস হয়ে যেত না চতুরচূড়ামণিদের ষড়যন্ত্র। আসা যাক সেই কাহিনীতে।

পথের বুঝি আর শেষ নেই। কালো ফিতের মতন পিচের রাস্তা সোজা চলে গেছে সামনে। দু'পাশে ছোট ছোট ঝোপ। বড় একঘেয়ে দৃশ্য। চোখ টাটিয়ে ওঠে। মনও খিঁচড়ে যায়।

শর্টকাট করবে বলেই এই পথ ধরেছিল অবিচল। সন্ধ্যের আগেই পৌঁছতে হবে শহরে। নাইট হল্ট করবে সেখানে। রোডম্যাপ খুলে দেখেছিল, হাইওয়ে ধরে গেলে সময় বেশি লাগবে। কিন্তু শ'খানেক কিলোমিটার পথ কমিয়ে আনা যাবে, যদি এই তেড়চা পথটা ধরে। এ পথ গেছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে; একটা নদীর ওপর দিয়ে। ম্যাপে এর বেশি কোনও নির্দেশ নেই।

দেখেই মনটা নেচে উঠেছিল অবিচলের। অ্যাডভেঞ্চারিস্ট অবিচল। যেখানে কেউ যায় না, সেখানে ও পা বাড়ায়। যা কেউ করে না, ও তাই করে। তা নাহলে, স্কুটারে মালপত্র চাপিয়ে বাংলা, বিহার, ওড়িশা টহল দেবে কেন? কোম্পানি তো বাসভাড়া আর ট্রেনভাড়া দেয়।

কিন্তু অবিচল তা চায় না। নিজের বাহনে চেপে চক্কর মারে তিন-তিনটে প্রদেশে। পথঘাট নখদর্পণে। মানুষজন পরমাত্মীয়। বাণিজ্য ঊর্ধ্বমুখী।

কারণ, ওর অ্যাডভেঞ্চারের নেশা। পথকে যে ভালবাসে, পথও যে তাকে ভালবাসে। তাই পথই ওকে এনে দিয়েছে জীবনের সাফল্য।

নতুন এই পথটা যে এরকম অন্তহীন ভালবাসার হবে, তা তো জানা ছিল না। রাস্তা তেলতেলে মসৃণ নয় বলে স্পীড তুলতে পারেনি। হাইওয়ে নয় বলেই পথের মসৃণতার দিকে নজর দেয়নি রাস্তার মালিকরা। এদিকে যে বিকেল গড়াতে চলল। সূর্য হেলে পড়ছে পশ্চিমে।

এমন সময় দেখা গেল ব্রীজটা।

সাদা সিমেন্টের সাদা সেতু। কালো রাস্তার ওপর মুকুটের মতন ঝকঝক করছে।

নদীটা তাহলে এসে গেছে।

ব্রীজের ওপর স্কুটার তুলে স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে দিল অবিচল। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দরকার। পথশোভাও উপভোগ করা প্রয়োজন। ধীরেসুস্থে বের করল সিগারেটের প্যাকেট। সাদা কাঠিতে অগ্নিসংযোগ করে নাক মুখ দিয়ে তামাকের ধোঁয়া বের করতে করতে চেয়ে দেখল চারপাশে।

মনোরম দৃশ্য। পথের একঘেয়েমি একটু আগে থেকেই ঘুচতে শুরু করেছিল। বড় বড় লম্বা গাছের জঙ্গল শুরু হয়ে গেছিল। ম্যাপের বর্ণনা মিলতে শুরু করেছে। এই অরণ্য ভেদ করে বেরিয়ে গেলেই পড়বে ওর নাইটহল্টের শহর।

বড় নির্জন অঞ্চল। আসবার সময়ে দু'একটা গাড়ি ছাড়া জীবন্ত মানুষ চোখেই পড়েনি। খাঁ-খাঁ করছিল চারিদিক। এখানে তবুও নদীর কলস্বর আছে, বনানীর শিৎকার আছে। বনজঙ্গলের মর্মরধ্বনিকে অবিচল বলে শিৎকার। ব্যাচেলর তো। প্রকৃতিকে দেখে নারীরূপে। ওর পৌরুষকে দেখে বনানী মাত্রই ওকে শিৎকার ধ্বনি দিয়ে আহ্বান জানায়!

মনের বিকার? হয়তো। অবিচল অবশ্য আর পাঁচজনের মতন নয়। সুতরাং ওর মনের বিকৃত ভাবনা নিয়ে আমাদের গবেষণা করার দরকার নেই।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, অবিচল সিগারেট ফুঁকছে আর চারপাশ দেখছে। পায়ের তলা দিয়ে ঝিরঝির করে নদী বয়ে যাচ্ছে। কলস্বিনীর কাতরানি বলেই ভ্রম হচ্ছে অবিচলের কাছে। নদীর দুপাড়ে লম্বা গাছগুলো নেমে এসেছে।

এমন সময়ে একটা চাপা মোটর গর্জন শোনা গেল। দূর থেকে এদিকেই আসছে একটা লরী। দেখাও যাচ্ছে। যেদিকে যেতে যেতে ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে গেছে অবিচল, সেইদিক থেকেই আসছে লরীটা। আসছে খুব আস্তে আস্তে। যেন বনের হাওয়া খেতে বেরিয়েছে।

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার নদী আর জঙ্গলের দিকে তাকিয়েছিল অবিচল। লরী যখন ওর পেছন দিয়ে ব্রীজ কাঁপিয়ে চলে যাচ্ছে, তখন, শুধু তখন চকিতের জন্যে ঘাড় বেঁকিয়েছিল।

সেইদিন....সেই মুহূর্তে...যদি ওইটুকু সময়ের জন্যে ঘাড় না বেঁকাত, যদি অরণ্য সৌন্দর্য নিয়েই বিভোর হয়ে থাকত, তাহলে আজকের এই কাহিনী লেখা হতো না। ওর জীবনের মোড়ও ঘুরে যেত না।

তাও পুরোপুরি তাকায়নি। আনমনাভাবে বাঘ-চোখের কোণ দিয়ে দেখেছিল ড্রাইভারকে। চেহারায় আর পোশাকে মামুলি ড্রাইভারদের মতন হতশ্রী নয়। যেন সামাজিক মর্যাদা আছে। চৌকো চোয়াল। শ্যেন-চঞ্চুর

মতন বক্র নাক। ফর্সা। সতর্ক আর ধূর্ত চাহনি।

তারপরেই চোখের কোণ দেখে নিয়েছিল গোটা গাড়িটাকে—নিমেষে চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার আগেই।

বড় ট্রাক। ম্যাড়মেড়ে সবুজ বডি। পাশে ইংরেজিতে লেখা: জগন্নাথ ফিশারিজ সিন্ডিকেট। তার তলায় পেতলের প্লেটে একটা নম্বরঃ 4।

এই পর্যন্ত দেখার পরই গাড়ি নেমে গেল ব্রীজ থেকে। ধীর গতিতে গড়িয়ে চলল কালো পিচের রাস্তা বেয়ে। মাছের আঁশটে গন্ধে ভরে গেল চারিদিক।

সিগারেট ফুরিয়ে এসেছে। অবিচল তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল কলস্বিনীর গর্ভে। স্কুটারের দিকে ফিরে স্টার্ট দিতে গিয়ে দেখল, ফোঁটা ফোঁটা তেল পড়ছে কালো রাস্তায়।

সর্বনাশ! ফের লীক করল নাকি? এই নিয়ে দ্বিতীয়বার হলো আজ। একটা নাট আলগা আছে। তেল বেরিয়ে যাচ্ছে ট্যাঙ্ক থেকে।

ভেসপা স্কুটারের এই মডেলে, ট্যাঙ্কের ওপর আর পেছনের ক্যারিয়ারের ওপর জিনিসপত্র রাখে অবিচল। গোটা সংসারটাকে বয়ে নিয়ে যায় স্কুটারের ওপর।

ঝটপট জিনিসপত্র নামাল ট্যাঙ্কের ওপর থেকে। ঢাকনি খুলে দেখল, তেল নেমে এসেছে রিজার্ভের কাছাকাছি।

এই সম্বল নিয়ে তো এতটা পথ পাড়ি দেওয়া সমীচিন নয়।

পথে অবশ্য গাড়ি-টাড়ি পাওয়া যেতে পারে। নাও পাওয়া যেতে পারে। সূর্য যখন ঢলেছে, তখন এই বিজন পথে কেউ নাও আসতে পারে।

যে লরীটা এখুনি চলে গেল, তাকে ধাওয়া করলে কেমন হয়? যাচ্ছে তো গজেন্দ্রগমনে। অবিচলের স্কুটার তাকে ধরে ফেলবে। একটু পেট্রল ভিক্ষে চেয়ে নেবে। ডিজেল লরী হলেও অনেকে পেট্রল রাখে আলাদা টিনে। দেখা যাক কপাল ঠুকে।

কিক মেরে স্টার্ট দিল অবিচল। ঝাঁকি মেরে মেরে থার্ড গিয়ারে স্পীড তুলে ধরে নিল লরীর নাগাল। দূর থেকেই দেখল, লরী টার্ন নিচ্ছে ডান দিকে। আস্তে আস্তে ঢুকে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

যাচ্চলে! আসবার সময়ে তো এ-পথ দেখেনি অবিচল। চোখ ছিল সামনে—অত খেয়াল করেনি। লরী উধাও হয়ে গেল জঙ্গল-বিবরে, অবিচলও এসে দাঁড়াল সেখানে। আস্তে আস্তে সামনের চাকা নামাল পাশের রাস্তায়। একটু গিয়েই বুঝল, স্কুটার চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ভারী ট্রাকের চাকার অত্যাচারে রাস্তার অবস্থা মর্মান্তিক।

তাই, স্কুটার স্ট্যান্ডে তুলে রাখল একটা গুঁড়ির পাশে। থাক মালপত্র। এই জঙ্গলে কে নিচ্ছে?

হেঁটেই ঢুকে গেল জঙ্গলে। বেশি দূর যেতে হলো না।

চমকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল অবিচল।

এরকম চমক সে লাভ করে কদাচ।

সরু রাস্তা বেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে এক তরুণী।

পরমাসুন্দরী না হলেও মেয়েটিকে দেখতে চমৎকার! সবুজ বনানীর সঙ্গে ম্যাচ করে জামাকাপড় পরায় সবুজে সবুজ হয়ে রয়েছে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। জিনস শার্ট আর পাছা-কামড়ে থাকা প্যান্ট পর্যন্ত সবুজ—ব্লু নয়। আপন মনে শিস দিয়ে গান গাইতে গাইতে মেয়েটি তার দিকেই আসছে বটে—কিন্তু চেয়ে আছে অন্য দিকে।

থ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে অপরূপাকে দুচোখ দিয়ে কিছুক্ষণ উপভোগ করেছিল অবিচল। মেয়েটার বয়স বড় জোর ২২ কি ২৪; অবিচলের বয়স ২৮। সুতরাং চিত্তে পুলক জাগা স্বাভাবিক। বিশেষ করে নিস্তব্ধ এই জঙ্গলে এমন একখানা স্মার্ট বিউটি দেখতে পাওয়াও তো একটা পিলে চমকানো কাণ্ড।

আচমকা দাঁড়িয়ে গেল বনের বিউটি। ততক্ষণে সে অবিচলের অনেক কাছে এসে গেছে। বড় বড় ঈষৎ-কটা চোখ মেলে দেখছে বন্য মানুষটাকে।

এগিয়ে গেল অবিচল। মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমাতে সে অদ্বিতীয়। প্রেম করতে পরম পটু। কিন্তু বিয়ে করে না কাউকেই। সবাই ওর বান্ধবী।

সুসভ্য হাসি হেসে বললে অবিচল—"নমস্কার। আমার নাম অবিচল বাগ। চলেছি একটু পেট্রলের সন্ধানে। বলতে পারেন কোথায় পাওয়া যাবে?"

অবিচল ওড়িয়া ভাষা গড়গড় করে বলে যেতে পারে। এই কথাগুলোও বলে গেল উৎকল ভাষায়।

মেয়েটিও তৎক্ষণাৎ সামলে নিল চমকিত ভাব। হাসি ফুটিয়ে তুলল চোখে আর মুখে। মেয়েরা না হাসলে তাদের রূপ খোলে না। এটা অবিচলের আবিষ্কার। এখনও দেখল, বনবালা আরও রূপসী হয়ে উঠেছে হেসে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে।

বললে ওড়িয়া ভাষাতেই—"পাবেন এখানেই। কিন্তু আপনি তো বাঙালি। ওড়িয়াতে কথা বলার দরকার নেই। আমিও বাঙালি।"

"সে কী!" খাঁটি বাংলায় বললে বিচলিত অবিচল—"এই জঙ্গলে কি করছেন? পিকনিকে এসেছেন নাকি?"

"এখানেই তো থাকি," মিঠে হেসে বলে গেল অনিন্দিতা— "বাবা আর আমি। মা তো মারা গেছে। মাছ চালান দিই।"

"ওই যে ফিশারিজ লরীটা এল এদিকে—"

"আমাদেরই কোম্পানির। আপনি এলেন কি করে? পিকনিক করতে?"

"না না, আমারও ব্যবসা রয়েছে। ওষুধ ফেরি করার কারবার। শর্টকাট করতে গিয়ে ঢুকে পড়েছি। ওই যে দেখছেন স্কুটারটা—আমারই। হারামজাদার তেল লীক করছে। তাই—"

চোখ কপালে তুলে ফেলল মেয়েটি—"স্কুটারে করে ওষুধ বেচতে বেরিয়েছেন?"

"চিরকালই করি। তবেই তো পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ হয়।"

"যেমন আমার সঙ্গে হয়ে গেল," বন কাঁপিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল সুন্দরী—"কি নাম আপনার?"

"বললাম তো। অবিচল বাগ।"

"বাঘ?"

"আজ্ঞে না। বাগ। ব-য়ে আকার আর গ। আপনার নাম?"

"তপতী। তপতী সান্যাল।"

"টিয়া নামটা মানাতো আপনাকে।"

ভুরু কুঁচকে গেল তপতীর—"কেন বলুন তো?"

"বন থেকে বেরিয়ে এলেন টিয়া পাখির মতন—টিয়ার মতন রঙিন সাজে, টিয়ার মতন টিয়া-টিয়া শিস দিতে দিতে।"

হেসে গড়িয়ে পড়ল তপতী—"আর আপনিও তো এলেন বনের বাঘের মতন—শুধু যা হালুম-হালুম করেননি।"

"বাঘের মতন দেখতে তো নয়।"

চোখ সরু করে অবিচলকে দেখতে দেখতে তপতী বললে—"কিছুটা।"

এবার অট্টহাসির পালা অবিচলের। ও আস্তে হাসতে জানে না। প্রাণখোলা মেজাজি হাসি। হেসে ফেলল তপতীও। বললে—"চলুন, এবার আপনাকে পেট্রল দেওয়া যাক।"

"আছে তো? সবই ডিজেলের লরী এখন।"

"আমরা রাখি। সব ফুয়েল-ই থাকে। কেরোসিন পর্যন্ত। আসুন।"

পাশাপাশি দুজনে ঢুকে গেল বনের ভেতরে। সরু পথ বাঁক নিয়েছে নদীর দিকে। তার পরেই বন আর নেই। খোলা চত্বর। বন কেটে সাফ করা চত্বর। সদ্য কাটা গুঁড়িগুলোর সাদাটে ভাব তখনও মিলোয়নি।

চত্বরটা ইংরেজি D অক্ষরের মতন। সিধে দিকটা রয়েছে নদীর দিকে। বাঁকা দিক ঘিরে রয়েছে গাছের সারি আর বন।

তপতী আবার শিস দেওয়া শুরু করেছে। শিস দিতে দিতে এগোচ্ছে যে দিকে, সেদিকে রয়েছে টিনের ছাউনি দেওয়া একটা লম্বা শেড। তার পাশেই একটা দোতলা বাড়ি।

আঁশটে গন্ধটা বেড়ে যাচ্ছে কেন, এবার তার কারণটা বোঝা গেল। চত্বর জুড়ে মাছ ছড়িয়ে শুকোনো হয়। কুচোকাচা শুকনো মাছ পড়ে পায়ের তলায়।

টিনের শেডের আরও কাছে চলে আসতেই দেখা গেল পাশ দিয়ে নদীটাকে। ছোট একটা জেটি। পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে সেই সবুজ লরীটা। ব্রীজের ওপর যে লরীটাকে চোখের কোণ দিয়ে দেখেছিল। গায়ে লেখা রয়েছে 'জগন্নাথ ফিশারিজ সিন্ডিকেট। নম্বর 3'।

চোখ কুঁচকে গেল অবিচলের।

নম্বর 3!

কিন্তু এই লরীর গায়েই নম্বর ছিল 4। একটু আগেই দেখেছে অবিচল। সেই রকমই ম্যাড়মেড়ে রঙ। একই লরী। সন্দেহ নেই।

অথচ নম্বর এখন 3!

লরীর ড্রাইভার নেমে এল ভেতর থেকে। অবিচলকে দেখতে পেয়েছে। থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। সেই লোকই বটে। চৌকো চোয়াল। বাঁকা নাক। ধূর্ত আর সতর্ক চাহনি।

এখন সেই চাহনিতে জেগেছে সন্দেহ। নির্নিমেষে দেখছে অবিচলকে। একটু একটু করে গোটা মুখ জুড়ে আবির্ভূত হলো বৈরীভাব। অবিচলকে যেন পরম শত্রুরূপেই গণ্য করছে গাঁট্টাগোট্টা এই ড্রাইভার।

ধন্ধে পড়ে অবিচল। তাকায় তপতীর দিকে। কারণ, আচমকা শিস দেওয়া বন্ধ করেছে তপতী।

মুখে নেই হাসি, নেই সেই হাল্কা উচ্ছলতা। চাপা উদ্বেগ, আর সেই সঙ্গে বেশ খানিকটা ভয়। মেঘের মতন অন্ধকার করে তুলেছে সুন্দর মুখটাকে।

তপতীও চেয়ে আছে ড্রাইভারের দিকে। তার চোখে চোখ রাখল ড্রাইভার। ঘুরে গিয়ে এগোল টিনের শেডের দিকে।

আর ঠিক এই সময়ে টিনের শেডের সামনের দরজা দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে এলেন দীর্ঘকায় এক পুরুষ। ধুতি পাঞ্জাবি পরা সুদর্শন এক প্রৌঢ়। ফর্সা। লম্বা চুল উড়ছে পেছন দিকে। ঈষৎ গোলাকার মুখ। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। সোজা এগিয়ে এলেন তপতী আর অবিচলের দিকে। একটু যেন শক্ত হয়ে রয়েছেন। কাছে আসতেই অবিচল দেখল, এঁরও মুখে চাপা উদ্বেগ। মুখভাব এমনিতেই একটু ভয়কাতুরে। ডেয়ারডেভিল অবিচল এই জাতীয় ভীতু মানুষদের অনুকম্পা করে। ড্রাইভার তাঁর সামনে গিয়ে খাটো গলায় কি বলতেই সন্দেহ নিবিড়তর হলো ভদ্রলোকের চোখেমুখে।

"আমার বাবা," বলেই ছুটে এগিয়ে গেছিল তপতী—ওর মুখ থেকে ভয় আর উৎকণ্ঠার মেঘ কেটে গেছে বাপকে দেখেই।

ড্রাইভারও ঢুকে গেছে টিনের শেডের মধ্যে।

সুবেশ সুঠাম ভদ্রলোকের চোখ মুখের সন্দেহ কিন্তু যায়নি। অবিচলের আপাদমস্তকে সন্দিগ্ধ চাহনি বুলিয়ে নিয়ে বললেন—"কি ব্যাপার?"

তপতী বললে—"একটু পেট্রল দেবে এঁকে?"

"কেন রে?"

কল-কল করে তপতী বলে গেল অবিচলের ডানপিটেমি আর দুর্দশার কাহিনী। শুনতে শুনতে হেসে ফেললেন শ্রীযুক্ত সান্যাল—তপতীর জনক।

বললেন—"দু'লিটারে হবে?"

অবিচল বললে—"যথেষ্ট।"

"তপতী, নিয়ে গিয়ে ঢেলে দিয়ে আয়। না না, দাম দিতে হবে না। বনবাদাড়ে থাকি, স্টকও রাখি।"

আরও দুচারটে ছেঁদো কথার পর ভদ্রলোক ফিরে গেলেন টিনের শেডের মধ্যে। ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে তপতী এক টিন পেট্রল নিয়ে। স্কুটারের কাছে ফিরে এসে ট্যাঙ্কে পেট্রল ঢালতে ঢালতে অপাঙ্গে চেয়ে বললে—"পথের বন্ধুকে পথ ফুরোলেই ভুলে যেতে হয়।"

মাথায় হেলমেট আঁটতে আঁটতে অবিচল বললে—"আপনার বাবার নামটা কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়নি?"

"নিমাই সান্যাল। মৎস্য-বিশেষজ্ঞ। এখানকার ম্যানেজার। সমুদ্রে মাছের শেষ নেই—বাবারও ব্যবসার শেষ নেই। ছুটি নেই আমারও।"

বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একলা থেকে নিশ্চয় হাঁফ ধরে গেছিল—অল্পসময়ের জন্যে হলেও একঝলক টাটকা হাওয়া বইয়ে দিয়ে গেল অবিচল—ওর যা স্বভাব।

সেই রাতে হোটেলের বিছানায় শুয়ে অবিচল শুধু ভেবেছিল নম্বর প্লেটের রহস্য নিয়ে। একই লরী, অথচ নম্বর পাল্টে গেল কিভাবে? কেনই বা অমন বৈরী চোখে তাকিয়ে রইল ড্রাইভার? বাপ-বেটির অত

ভয়টাই বা কিসের?

॥ ২ ॥

অভিযান

অবিচল থাকে বেলেঘাটায় বাইপাসের ধারে—সি.আই.টি কোয়ার্টারে। এখান থেকে সুভাষ সরোবর হাঁটা পথে মিনিট দশেক। কলকাতায় থাকলেই মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে ইন্দ্রনাথ রুদ্রর ডেরায় হানা দেয়। খেজুরে আলাপ করে। ইন্দ্রনাথ বিলক্ষণ স্নেহ করে ডেয়ারিং অবিচলকে। নিজেও তো তাই।

জঙ্গলের রহস্য মাথার মধ্যে নিয়ে কলকাতায় ফিরেই পরের দিন ভোরে ইন্দ্রনাথের ব্যাচেলরস্ 'ডেনে' চলে গেছিল অবিচল। গিয়েই শুরু করেছিল জগন্নাথ ফিশারিজ সিন্ডিকেটের লরীর নম্বর পরিবর্তনের রহস্য কাহিনী।

ইন্দ্রনাথ সোফার ওপর পা তুলে বসে সব শুনল। তারপর বললে—ডিটেকটিভ গল্পের বাজার ভালই যাচ্ছে মনে হচ্ছে। বই পড়েই পাঠকরা গোয়েন্দা হয়ে যাচ্ছে।

অবিচল বললে—"আপনি কি গোটা ব্যাপারটায় একটা জাল-জোচ্চুরির গন্ধ পাচ্ছেন না?"

"পাচ্ছি। এক, তুমি স্পষ্ট দেখেছিলে, ব্রীজের ওপর লরীর নাম্বার ছিল 4, শেডের সামনে গিয়ে একই লরীর নাম্বার হয়ে গেল 3। না, চোখের ভুল তোমার হয় না। দুই, ড্রাইভার তোমাকে দেখে থমকে গেল, সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রইল, ম্যানেজারকে ফিসফিস করে কি বলতে সে ভদ্রলোকও সন্দেহের চোখে তোমার দিকে এগিয়ে এলেন—না জানি কি গুপ্ত ব্যাপার তুমি জেনে ফেলেছ। তিন, তোমার প্রেয়সী তপতীও জানে এই গুপ্ত ব্যাপার। তাই অত শক্ত কাঠ হয়ে গেছিল ড্রাইভারকে দেখে।"

"প্রথমেই আপত্তি জানিয়ে বলি," বললে অবিচল—"তপতী আমার প্রেয়সী নয়—বান্ধবী।"

"ও রকম সাফাই শ'খানেকবার এর আগেও শুনেছি।"

"ড্রাইভারের সঙ্গেই প্রণয় থাকতে পারে তপতীর। লোকটার চেহারা মডার্ন রোমিওর মতো। ড্রাইভারের মতন কাঠখোট্টা নয়।"

"তাতেই তোমার আপত্তি। তুমি নিজেই যে একটা মডার্ন রোমিও।"

"ইন্দ্রনাথদা, আমি এই মিস্ট্রি সলভ করতে চাই।"

"কোন মিস্ট্রি? তপতী-ড্রাইভারের গোপন প্রণয়, না নম্বর প্লেটের ভৌতিক পরিবর্তন?"

"দুটোরই। তপতীকে আমার ভাল লেগে গেছে।"

মুচকি হেসে ইন্দ্রনাথ বললে—"সেটা বোঝা গেছে। কি দেখে ভাল লাগল?"

"ওর চোখ দেখে।"

"চোখ?"

"বিড়ালাক্ষি বলতে পারেন। চোখের মধ্যে যেন আগুন রয়েছে—অথচ মুখে ঝরছে মধু।"

"অর্থাৎ বাঘিনী?"

"বলতে পারেন।"

"আর তুমি হলে বাঘ।"

"তপতীর বাবার চলাফেরাও বাঘের মতন।"

"তবে যে বললে খুব ভিতু টাইপের?"

"মুখের ভাবে তাই। কারবার সামলাতে গিয়ে বাঘের বাচ্চাদেরও ওই হাল হয়। কোঁচা দুলিয়ে ভদ্রলোক যখন তেড়ে এলেন, মনে হলো যেন বনের বাঘ আসছে।"

সকৌতুকে ইন্দ্রনাথ বললে—"তুমি এই বাঘ আর তার মেয়ের গুপ্ত রহস্য জানতে চাও?"

"এগজ্যাক্টলি।"

"আর কি-কি সন্দেহ তোমার মাথায় ঘুরপাক দিচ্ছে?"

"পথে ঘুরি বলেই পথের অনেক খবর রাখি। জলপথ আর স্থলপথ দুনম্বর কারবারিদের কাছে এখন মস্ত সহায়। মাছের গুদোমের পাশে একটা ছোট্ট জেটি দেখেছি।"

"তা বলেওছো।"

"সেই জেটিতে নিশ্চয় মোটর বোট জাতীয় কিছু ভেড়ে।"

"ভিড়তে পারে। মাছ চালান দেওয়ার জন্যে।"

"সেই মাছ নিশ্চয় শঙ্করপুর বা অন্য কোথাও যায়।"

"তা তো যাবেই।"

"মোটর বোট কি খালি ফেরে?"

চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ।

অবিচল বলে গেল—"খালি ফিরলে ফয়দা হয় না—অন্য মাল নিয়ে ফিরলে পুষিয়ে যায়। সে মালটা কি ধরনের? স্মাগলিং চলছে না তো?"

সঙ্কুচিত হলো ইন্দ্রনাথের সুন্দর দুই চক্ষু।

অবিচল বলেই চলেছে—"শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অনেক জিনিসই আনা-নেওয়া হতে পারে। আগন্তুককে দেখে মৎস্য বিশেষজ্ঞের অত ভয় কেন?"

"পুলিশকে খবর দাও।"

"না," অবিচল কাঠ হাসে—"তাতে তপতী জড়িয়ে পড়বে।"

"পড়ুক", নির্মম কণ্ঠস্বর ইন্দ্রনাথের—"আইন-শৃঙ্খলা আগে—প্রেম পরিণয় পরে।"

"না।" অবিচল বিলক্ষণ কাঠগোঁয়ার—"প্রেম পরিণয় আগে—আইন-শৃঙ্খলা পরে। বেচাল কিছু দেখলে তপতীকে আমি ওখান থেকে বের করে আনব—ওর বাপকেও।"

"তারপর?"

অম্লানবদনে অবিচল বললে—"বিয়ে করব। ওকে ছেড়ে বাঁচতে পারব না।"

"এরকম ঘোষণা আগেও বহুবার শুনেছি। যাক, কি করতে হবে?"

"আমার সঙ্গে আপনি যাবেন।"

"তথাস্তু।"

স্কুটারে মাইলের পর মাইল উড়ে যাওয়ার মধ্যে আছে আশ্চর্য এক পাগলামি। নেশাও বলা যায়। অবিচলের এই নেশার স্বাদ নিতেই ইন্দ্রনাথ বেরিয়েছিল ওর সঙ্গে। ও তো আর কারও মাইনে করা গোয়েন্দা নয়। যখন যে ধাঁধা ওর মন টানে, সেই ধাঁধায় গা ভাসিয়ে দেয়—নইলে দিনের পর দিন বাড়িতে বসে থাকে।

নাম্বার প্লেটের রহস্যময় পরিবর্তন ওর মনকে টেনেছিল। তাই দিন কয়েক পরে সেই জঙ্গলে দেখা গেল এই দুই মূর্তিমানকে। সরু পথ থেকে বেশ খানিকটা দূরে। স্কুটার লুকিয়ে রেখেছে জঙ্গলে। নিজেরাও রয়েছে গাছের আড়ালে। ইন্দ্রনাথের হাতে রয়েছে বাইনোকুলার।

সময়ের হিসেবটা মাথার মধ্যেই ছিল অবিচলের। সূর্য যখন হেলে পড়ে পশ্চিমে—ঠিক তখনই সেদিনের সেই লরী শহরের দিক থেকে এসেছিল, পেরিয়ে

গেছিল ব্রীজ।

সেই সময়ের অনেক আগে থেকেই জঙ্গলের খোঁদলে ঘাপটি মেরে রয়েছে দুজনে।

দূরে শোনা গেল লরীর আওয়াজ। বাইনোকুলারে ভেসে উঠল সবুজ লরীর চেহারা। অবিচলের হাতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র তুলে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে—"দ্যাখো হে—সেই লরী তো?"

চোখে দূরবীন দিতে না দিতেই স্তব্ধ হলো লরীর আওয়াজ। আর, শক্ত কাঠ হয়ে গেল অবিচল।

ইন্দ্রনাথ বললে—"কি দেখছ?"

অবিচল বললে—"আর এক রহস্য।"

"মানে?"

"নাম্বার প্লেট পালটাচ্ছে ড্রাইভার।...হয়ে গেল পালটানো।...আসছে।"

দূরবীন নামিয়ে হতভম্ব চোখে ইন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে রইল অবিচল।

ইন্দ্রনাথ চেয়ে আছে রাস্তার দিকে। চোখের তারা ছোট। মুখ গম্ভীর।

গুড়গুড় করে সবুজ লরী বেরিয়ে গেল সামনে দিয়ে। ব্রীজে উঠল। নামল। আরও খানিকদূর গিয়ে ডাইনে মোড় নিয়ে ঢুকে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

অবিচলের দিকে চোখ ফেরায় ইন্দ্রনাথ—"এবার বলো কি দেখে অমন আঁতকে উঠলে।"

"গাড়ির নাম্বারটা দেখলেন?"

"চার নম্বর।"

"ওটা ছিল এক নম্বর। লরী দাঁড় করিয়ে ড্রাইভার পকেট থেকে বের করল চার নম্বরের প্লেট। পাশে গিয়ে ঘাঁটির মধ্যে থেকে এক নম্বর প্লেট বের করে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল চার নম্বর প্লেট। এক নম্বর প্লেট রাখল পকেটে। ওপাশে গিয়েও করল একই ব্যাপার। কয়েক সেকেন্ডেই পাল্টে গেল গাড়ির নাম্বার।"

একটু ভেবে নিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে—"লরী কি এখন ফিরবে বলে মনে হয়?"

"মনে তো হয়। শহর এখান থেকে বেশি দূরে নয়। মাল খালাস করেই নিশ্চয় ফিরবে।"

"তাহলে আর একটু বসা যাক।"

বেশিক্ষণ বসতে হলো না। ঘন্টাখানেক বাদেই আবার লরীর গর্জন শোনা গেল জঙ্গলের মধ্যে। ফিরে এল সবুজ লরী। উঠল ব্রীজে। নামল। আরও একটু গিয়ে দাঁড়াল। দূরবীনের মধ্যে দিয়ে এবার ইন্দ্রনাথ নিজেই দেখল সেই অদ্ভুত কাণ্ড।

লরী থেকে নেমে নম্বর প্লেট পাল্টাপাল্টি করে দিল ড্রাইভার। চার নম্বর প্লেটের বদলে এক নম্বর।

লরীর আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই উঠে পড়ল ইন্দ্রনাথ—"চলো।"

"কোথায়?"

"তোমার বান্ধবীর কাছে।"

স্কুটারের আওয়াজ নিস্তব্ধ জঙ্গলে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির রেশ তুলেছিল। এমন অসময়ে দ্বিচক্র বাহন নিয়ে ছুট করে কার আবির্ভাব ঘটেছে, দেখবার জন্যে বেরিয়ে এসেছিল টিনের শেডের মধ্যে থেকে কাজের লোকজন। দোতলা বাড়ি থেকে তপতী আর নিমাই সান্যাল। দুজনেই সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে আছে ইন্দ্রনাথ আর অবিচলের দিকে।

হেলমেট খুলতে খুলতে সপ্রতিভ পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে অবিচল বললে—"চিনতে পারছেন?"

হাতের ইঙ্গিতে কর্মচারিদের শেডের মধ্যে যেতে বলে মুখ খুললেন নিমাই সান্যাল—"পারছি। পেট্রল নিয়ে গেছিলেন?"

"হ্যাঁ। আবার এলাম।"

"পেট্রল ফেরৎ দিতে?"

"না, না। আমার এই দাদাকে নিয়ে ট্যুরে বেরিয়েছি। স্রেফ প্লেজার ট্রিপ। ভাবলাম আপনার কারখানাটা দেখিয়ে নিয়ে যাই। —ইন্দ্রনাথদা, ইনি নিমাই সান্যাল। আর ইনি তপতী সান্যাল। —ইন্দ্রনাথ বক্সী কবি এবং লেখক। চেহারা দেখেই বুঝছেন," বলেই বন কাঁপিয়ে অট্টহেসে উঠল অবিচল।

ইন্দ্রনাথের কবি-কবি চেহারার দিকে তাকিয়ে নিমাই সান্যাল বললেন—"মাছের গন্ধ নাকে গেলে লেখা উবে যাবে আপনার।"

পকেট থেকে ল্যাভেন্ডার-নিষিক্ত রুমাল বের করল ইন্দ্রনাথ। হাওয়ায় সুবাস ছড়িয়ে দিয়ে বললে—"সে ব্যবস্থা পকেটেই থাকে। আপনার দুঃসাহস দেখে কিন্তু কৌতূহলে ফেটে যাচ্ছি।"

চাপা সন্দেহ আরও ঘন হলো নিমাই সান্যালের দুই চোখে। বিপুল অস্বস্তি দেখা দিয়েছে তপতীর হাবভাবে। বেড়াল-চোখে অপাঙ্গে বারকয়েক দৃষ্টি-বিনিময় করে নিয়েছিল অবিচলের সঙ্গে। মুখে কিন্তু হাসির জ্যোতি নেই।

নিমাই সান্যাল কেটে কেটে বললেন—"দুঃসাহস! কিসের?"

"এই জঙ্গলে বাপ-বেটিতে মাছের আড়ৎ খুলে বসা।"

এতক্ষণে হাসলেন নিমাই সান্যাল। কাষ্ঠহাসি। বললেন—"এর মধ্যে দুঃসাহস নেই। আছে পেটের জ্বালা। জঙ্গলে থাকি—নিঃসঙ্গ। এইটুকুই যা অসুবিধে। চাকরি অতি সামান্য। মাছ আসছে। গোডাউনে রাখছি। বোট আসছে। তুলে দিচ্ছি। ব্যস—কাজ শেষ।"

জেটির দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে—"ওই বোটে?"

"হ্যাঁ, ওই বোটে," জেটির গা ঘেঁষে নোঙর করা মোটর বোটের দিকে চেয়ে বললেন নিমাই সান্যাল। বেশ ঝকঝকে বোট। উজ্জ্বল সবুজ রঙ।—"সোজা নিয়ে গিয়ে ফেলবে শঙ্করপুরে—মাছের আড়তে।"

"ফিরবে কি নিয়ে?"

যেন একটা ধাক্কা খেলেন নিমাই সান্যাল। সামলে নিলেন চকিতেই। বললেন অবহেলার ভঙ্গিমায়—"খালিই ফিরবে।"

"লরীভর্তি মাছ রাখেন কোথায়?"

"আসুন না, দেখে যান," কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পেরে যেন বেঁচে গেলেন নিমাই সান্যাল। পেছন ফিরেই হনহনিয়ে ঢুকে গেলেন টিনের শেডে। পেছনে ইন্দ্রনাথ। তার পেছনে অবিচল আর তপতী—পাশাপাশি কিনা, সেটা ইচ্ছে করেই মুখ ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করল না ইন্দ্রনাথ।

আঁশটে গন্ধে টেঁকা দায়। চারজন লোক কাঠের পেটি সাজাচ্ছে একদিকে। খালি পেটি। আর একদিকে জড়ো করা রয়েছে শুকনো মাছ। তৃতীয় দিকে রয়েছে মাছভর্তি পেটি।

ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন নিমাইবাবু।

চতুর্থ দিকটায় নিশ্চয় লরী দাঁড়ায়। মেঝেতে মোবিল আর চাকার চিহ্ন। এখানে চৌখোপি কাঠের পার্টিশন। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত।

ইন্দনাথ সোদকে তাকিয়ে রয়েছে দেখে নিমাইবাবু বললেন—"পাশেই আমার অফিস। আসুন, একটু বসে যান। কফি করে আনুক তপতী।"

তপতী গেল দোতলা বাড়ির মধ্যে কফি বানাতে। ওরা তিনজনে বসল অফিসঘরে। অল্প ফার্নিচার। টেবিল, চেয়ার আর একটা আলমারি। টেবিলটা ঘরের মাঝে, আলমারিটা কাঠের পার্টিশন ঘেঁষে—যার ওপাশে রয়েছে মাছের গুদোম।

রিভলভিং চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর রাখা বাক্স থেকে চুরুট বের করলেন নিমাইবাবু—বাক্স এগিয়ে দিতেই একটা চুরুট তুলে নিল ইন্দ্রনাথ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললে—"খাসা ব্র্যান্ড।"

"আছে চুরুটের নেশা?" নিমাইবাবুর প্রশ্ন।

"ছিল, এখন নস্যি ধরেছি। তবে একটা খেলে ক্ষতি নেই। দিন দেশলাই।"—ধোঁয়া বেরোলো নাক মুখ দিয়ে—"তোফা! জঙ্গলে এমন জিনিস—"

"কলকাতা থেকে আনাই। কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো।—এই তো এসে গেছে তপতী। ফ্লাস্কেই করে রেখেছিলি? দে, দে। নিন মিঃ বক্সী, আপনার নামে আর এক ভদ্রলোকের অনেক গল্প পড়েছি। শার্লক হোমসকেও হার মানিয়ে দেন।"

চোখে চোখে চেয়ে ইন্দ্রনাথ বললে—"তিনি ব্যোমকেশ বক্সী—গল্পের গোয়েন্দা।"

"গল্পের মধ্যেই এসব লোককে মানায়, কি বলেন?"

চুরুটটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে ইন্দ্রনাথ বললে—"অনেক গল্প অবশ্য সত্যি ঘটনাকে অবলম্বন করে লেখা হয়।"

অবিচল হাতঘড়িটা ইন্দ্রনাথের চোখের সামনে তুলে ধরল—"গল্প নিয়ে মাতছেন—কটা বাজে খেয়াল আছে? সন্ধ্যের সময় স্কুটার ড্রাইভিং রিস্কি।"

কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে পড়ল ইন্দ্রনাথ। নিমাই সান্যালের সঙ্গে বেরিয়ে গেল আগে।

পেছনে রইল অবিচল আর তপতী।

জঙ্গলের পথে মোড় নিয়ে বেশখানিকটা দূরে এসে ইন্দ্রনাথ বললে—"দাঁড়া অবিচল।"

"কেন?"

"নাইট ডিউটি দেব জঙ্গলে।"

স্কুটার দাঁড়িয়ে গেল। ঠেলে ঠেলে তাকে পাশের ঝোপে ঢোকানো হলো। হেলমেট খুলে অবিচল বললে—"ঝোঁকের মাথায় বক্সী টাইটেলটা লাগিয়ে ফেলে খুব ভুল করেছি। নিমাইবাবুর সন্দেহ হয়েছে। তপতীও ঘনঘন আপনার দিকে তাকাচ্ছিল।"

"উজবুক বলেই ভুলটা করলি। এখন আর সময় দেওয়া সমীচীন নয়। নিমাই সান্যাল গভীর জলের মাছ। তপতীও ভিজে বেড়াল নয়—চোখ যার বেড়ালের মতন—"

"চোখের সঙ্গে মনের সম্পর্ক নেই। মেয়েটা ভাল।"

"মরেছে।"

"কি করতে চান?"

"আজ রাতে হানা দেব মাছের গুদোমে।"

"কেন?"

"যত রহস্য ওই গুদোম ঘরেই—তাই অত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালেন। প্রচ্ছন্ন চ্যালেঞ্জও ছুঁড়ে দিলেন।...নম্বর প্লেট!...নম্বর প্লেট!...লরী দাঁড়ায় পার্টিশনের পাশে। কেন?"

ঠিক এই সময়ে ফের লরীর আওয়াজ শোনা গেল। শহরের দিক থেকে আবার আসছে লরী। এবার হেডলাইট জ্বালিয়ে। কারণ, অন্ধকার ঘনাচ্ছে বনে বনে।

লরী কিন্তু দাঁড়াল না। সোজা চলে গিয়ে ব্রীজে উঠে গিয়ে মিলিয়ে গেল। তারপর সব স্তব্ধ। লরী থেমেছে—নিশ্চয় মাছের আড়তে।

অন্ধকারে গা মিশিয়ে দুই মূর্তিমান এগিয়ে গেল সেদিকেই। বেশিদূর যেতে হলো না। ব্রীজের কাছাকাছি আসতেই একটা ছায়ামূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল উল্টো দিক থেকে।

থমকে দাঁড়ালো এরা।

ছায়ামূর্তি উঠে পড়েছে ব্রীজের ওপর। দাঁড়িয়ে পড়েছে সেখানেই।

তীক্ষ্ণ চোখে দুই মূর্তিমান তাকিয়ে সেদিকে। তারার আলোয় চোখ সয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

অস্ফুট গলায় অবিচল বললে—"তপতা!...এই অন্ধকারে? একা?"

পিচ্ছিল গলায় ইন্দ্রনাথ বললে—"মাথা গরম হয়েছে নিশ্চয়। এই বয়েসে এরকমই হয়। ভরা যৌবন...নিঃসঙ্গ জীবন... অশ্বারোহীর ঘনঘন আবির্ভাব।"

"অশ্বারোহী?"

"তুই। এ যুগের ঘোড়া তো তোর স্কুটার।...যা এগিয়ে যা।"

"যাব?"

"আলবৎ যাবি। এই তো সুযোগ। এরকম প্রেম করার সুযোগ আর পরিবেশ ক'জনের ভাগ্যে জোটে? ...তুই শুধু প্রেমের কথাই বলবি না—"

"আবার কি বলব?"

"ন্যাকা!... বলবি, বিয়ে করতে চাই।"

"তা তো বলবই।"

"ননসেন্স!... সোজা বলবি, তোমরা যাকে সন্দেহ করেছিলে, সেই ইন্দ্রনাথ লোকটা সত্যিই গোয়েন্দা। এখানে দু'নম্বরি কারবারের গন্ধ পেয়েছে। পুলিশে খবর দেবে বলছে। কিন্তু দিলেই তো তুমি আর তোমার বাবা জড়িয়ে পড়বে। সুতরাং এখুনি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দাও—তোমার বাবাকে ম্যানেজারি ছেড়ে সরে পড়তে বলো—আমি তোমাকে বউ বানিয়ে কেটে পড়ি—মরুক জগন্নাথ ফিশারিজ সিন্ডিকেট।"

"এত কথা গুছিয়ে কি বলতে পারব?"

"মারব টেনে এক থাপ্পড়!"

মার্জার চরণে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল অবিচল। ব্রীজের ওপর উঠতেই আঁতকে উঠল তপতী।

"আমি। দেবদাস।"

"সে আবার কে?"

"আসলে আমি একটা উজবুক। আমার ভাল নাম অবিচল। তোমাকে দেখবার পর থেকেই দেবদাস হয়ে যাচ্ছি।"

"একেবারে গেলে বাঁচি।"

"তাহলেও ইন্দ্রনাথদা ছাড়বে না।"

"তোমার গোয়েন্দা বন্ধু?"

"যাক বাবা, আপনি থেকে সটাসট তুমিতে চলে আসা গেল। এবার নেক্সট স্টেপ। ইন্দ্রনাথদা গোয়েন্দা, কি করে বুঝলে?"

"সত্যিই মাথায় গোবর আছে। ইন্দ্রনাথ রুদ্রর গল্প আমি পড়ি, বাবাও পড়ে।"

"কিন্তু আমি তো আসল নাম বলিনি।"

"কি মুখ্যু! নম্বর প্লেট দেখেই সন্দেহ করেছিলে বলেই তো ফের এসেছো সন্দেহ যাচাই করতে—সঙ্গে নিশ্চয় টিকটিকি থাকবে। গল্পে ইন্দ্রনাথ রুদ্রর যা বর্ণনা—চোখের সামনে তা দেখলাম।"

"নম্বর প্লেটের পাল্টাপাল্টি আমি দেখেছি, কি করে বুঝলে?"

"তোমার চোখ দেখে।"

"এই জন্যেই তোমাকে বাঘিনী বলেছিল।"

"কে বলেছিল?"

"ইন্দ্রনাথ রুদ্র।"

"আমার চোখ কটা বলে?"

"না, না, তোমার চোখে আগুন আছে বলে।"

"তোষামোদ করতে হবে না।"

"করতেও আসিনি।"

"তবে কি জন্যে এসেছো?"

"তোমাকে বিয়ে করতে।"

"ইস! আস্পা দেখে আর বাঁচি না।"

"কেন, আমি কি পাত্র খারাপ?"

"তুমি হলে আকাশের ওই তারা। কুচো হয়ে এসে ঝরে পড়েছো আমার সামনে।"

"শুধু তারা নয়, যুগল-তারা—একটার কুচো আমি, আর একটার কুচো তুমি।"

"ভারি সুন্দর কথা বলো তো।"

"তবুও বিয়ে করতে চাইছো না।"

"করা সম্ভব নয়, অবিচল।"

"গলার স্বরটা গম্ভীর হয়ে গেল তপতী।"

"অন্ধকার ফুঁড়ে আমার চোখ দেখতে পেলে আরও একটা জিনিস দেখতে পেতে।"

?"

"না, জল।"

"কেন? কেন? কেন? তোমার চোখে জল কেন?"

"যতদিন না বাবা এই ফাঁদ কেটে বেরিয়ে যেতে পারছেন, ততদিন...ততদিন বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"ফাঁদ! কে পেতেছে?"

"এই কোম্পানির কর্তারা।"

"ফাঁদে পা দিলেন কেন তোমার বাবা?"

"একটা কুকর্ম করে ফেলেছিলেন। চাকরি করতেন যে কোম্পানিতে তার টাকা সরিয়ে মায়ের চিকিৎসা করেছিলেন। মার ক্যানসার হয়েছিল, বাঁচল না। বাবারও চাকরি গেল—কিন্তু জেলে যেতে হলো না। সব টাকা মিটিয়ে দিল এই কোম্পানির কর্তারা।"

"লাগিয়ে দিল দু'নম্বরি কারবারের ম্যানেজারিতে?"

"হ্যাঁ। বাবা এখন অসহায়।"

"কারবারটা মাছের চালান?"

"না।"

"তবে কী?"

"আমিও জানি না। বাবা বলেন না। শুধু ভেবে মরেন আমার জন্যে। আমার চোখ দেখেই বুঝেছেন—আমি মরেছি।"

"আমার জন্যে?"

"হ্যাঁ।"

"তবে একেবারে মেরে ফেললেই পারেন।"

"পারবেন না—এই সিন্ডিকেটের ভয়ে। আমি যাকে বিয়ে করব—তারও যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে।"

"কেন?"

"কারণ, এদের বিশ্বাস, বাবার কাছে থেকে আমিও সব জানি। কিন্তু ওই নম্বর প্লেটের বদলাবদলি ছাড়া কিসসু জানি না। কেন যে পালটায় প্লেট, ভীমকুমার তাও বলেনি আমাকে—"

"ড্রাইভারের নাম ভীমকুমার! হাসালে দেখছি!"

"কিন্তু ব্রীজে দাঁড়িয়ে তুমি যে চার নম্বর দেখেছিলে—তা ও আঁচ করেছে। আড়তে দাঁড়িয়ে তিন নম্বর দেখে থ হয়ে গেছিলে—তাও বাবাকে বলেছে। আমার সঙ্গে তোমার দহরম মহরম ওর ভাল লাগেনি—"

"মেরে পাট করে দেব—"

"জেলাসির সময় এটা নয়। ভীমকুমার আমাকে বউ করতে চায়। কব্জায় রাখার জন্যে। মহা ফাঁপরে পড়েছেন বাবা।"

এতক্ষণে তপতীর চোখের জলের কারণটা মাথায় ঢুকল অবিচলের। এ যে শাঁখের করাত। চুপ করে যখন ভাবছে কি করা যায়, ঠিক এই সময়ে ফটাস করে একটা আওয়াজ হলো মাছের আড়তের দিকে।

চমকে বললে তপতী—"ও কিসের শব্দ?"

ফ্যাকাশে মুখে অবিচল বললে—"গুলির শব্দ।"

পরক্ষণেই জাগ্রত হলো লরীর আওয়াজ। এবার আর ধীরে সুস্থে আসছে না। পাগলা হাতির মতনই জঙ্গলের সরু পথ বেয়ে ধেয়ে আসছে। হেডলাইটের আলোয় ঝলকে ঝলকে উঠছে গাছপালা। রাস্তায় উঠেই বাঁক নিয়ে সোজা তেড়ে এল ব্রীজের দিকে।

এই সময়ে ডাকাবুকো অবিচলের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কাজ করেছিল, প্রাণে বেঁচে গেল নিজে—বাঁচিয়ে দিল তপতীকে।

হেডলাইটের আলো ওদের পাশাপাশি মূর্তি ভাসিয়ে দিয়েছিল। নিমেষে ব্রীজ থেকে ছিটকে গিয়ে তপতীকে টানতে টানতে জঙ্গলে ঢুকে গেছিল।

ফটাস-ফটাস-ফটাস শব্দ এবার ভেসে এল লরী থেকেই। কিন্তু একটা গুলিও গায়ে লাগল না। লরীও থামল না। ঝড়ের মতো উড়ে গেল শহরের দিকে।

॥ ৩ ॥
দু'নম্বর কারবার

বনাঞ্চল আবার স্তব্ধ। ঝুঝি থ মেরে গেছে আচমকা কলরবে। লরীর গজরানি অনেক আগেই বিলীন হয়েছে দূর হতে দূরে।

এখন শুধু শোনা যাচ্ছে ঝিল্লীর ঐকতান। উগ্র থেকে উগ্রতর হচ্ছে। অন্তরীক্ষে বসে যিনি পরিচালনা করছেন এই বিচিত্র রহস্যনাটক—এবার বুঝি তিনি ঝিল্লীরবের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক শুরু করেছেন।

অ্যাড্রেনালিন গ্ল্যান্ডের রসক্ষরণ নিশ্চয় বৃদ্ধি পেয়েছিল অবিচলের রক্তপ্রবাহে।

উত্তাল হয়েছিল শোণিত স্রোত। টাইডাল ওয়েভের মতনই তা আছড়ে আছড়ে পড়ছিল মস্তিষ্কে। টগবগিয়ে ছুটছিল হৃৎপিণ্ড। শক্ত হয়েছে প্রতিটি পেশী। নিবিড় অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। পাঠক কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। চোয়াল কঠিন। এখন তা নিছক অস্থিময় যেন নয়—গ্র্যানাইট-নির্মিত। হাতের দশটা আঙুলও সহসা বেঁকে গেছে।

বাঁ হাতের সাঁড়াশি-আঙুল দিয়ে খামচে ধরে রয়েছে তপতীর মণিবন্ধ। এত জোরে যে রক্ত বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে বিশেষ ওই অঞ্চলে।

তপতীর তা খেয়াল নেই। ঘটনার আকস্মিকতায় সে স্তম্ভিত। বনের বিভীষিকায় সে কখনও ত্রস্তা হয়নি—কিন্তু এইমাত্র যে ঘটনাগুলো পর পর ঘটে গেল—তা তার নার্ভ কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে।

পাঠক, তারার আলোয় এখন তার মুখাবয়ব নিরীক্ষণ করতে পারেন। প্রেমালোকে একটু আগেই এই মুখ ছিল ভাস্বর। এখন তা পাণ্ডুর। বিবর্ণ। চপল দুই চক্ষুতারকাও সহসা নিষ্প্রভ।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় দু'জনেই।

ঝিল্লীর কনসার্ট বিরামহীন।

উৎকণ্ঠা ধাপে ধাপে ঊর্ধ্বমুখী।

সহসা উচ্চকণ্ঠে জাগ্রত হলো একটা কণ্ঠস্বর। একটা নিনাদ। বনশীর্ষ ছাপিয়ে পত্রমর্মরকে সচকিত করে সেই কণ্ঠস্বর ভেসে এল বহুদূর থেকে।

"অবিচল।"

শুধু ওই একবার। কিন্তু চকিতে চিনে নিয়েছে অবিচল।

ইন্দ্রনাথ রুদ্র ডাকছে। ওই এক ডাকের মধ্যে নিঃসীম ব্যাকুলতা ঝরে পড়ছে। পুঞ্জীভূত উদ্বেগ ফেটে পড়তে চাইছে। অন্ধকারকে নাচিয়ে নাচিয়ে ভেসে আসছে হৃদয়ের আকুলতা।

ফলটা হলো জাদুমন্ত্রের মতো। নিমেষে কেটে গেল অবিচলের মুহ্যমান অবস্থা। এতক্ষণ বিকল ছিল যে বাকযন্ত্র, চকিতে শক্তি সঞ্চারিত হলো তার মধ্যে।

"এই যে আমি।"

"গায়ে গুলি লেগেছে?"

"লাগেনি।"

"তপতীর?"

"অক্ষত।"

"তাহলে দাঁড়িয়ে আছো কেন? এসো।"

"যাই।"

কথা শেষ না করেই দৌড়েছিল অবিচল। তপতীর কব্জি ছাড়েনি। নিবিড় অন্ধকার এখন চোখে সয়ে গেছে। সরু পথটায় অন্ধকার নিবিড়তর হয়েছিল বলে চিনতে অসুবিধে হলো না। ঢুকতে না ঢুকতেই উল্টোদিক থেকে শোনা গেল খচমচ খড়মড় শব্দ।

বায়ুবেগে ধেয়ে আসছে একটা ছায়ামূর্তি।

দাঁড়িয়ে গেল অবিচল। তপতী ওর পেছনে।

স্তব্ধ হয়েছে ছায়ামূর্তিও। ওদের সামনেই—কয়েক হাত দূরে।

ধ্বনিত হলো অতি পরিচিত সংযত স্বর—"আমি, আমি।"

"ইন্দ্রনাথদা?"

ঠিক এই সময়ে শান্ত মেয়ে তপতীর প্রতিটি অণুপরমাণুতে নিশ্চয় বিস্ফোরণ ঘটে গেছিল। নইলে সে সর্বশক্তি দিয়ে অবিচলের লৌহ মুষ্টি থেকে নিজের মণিবন্ধ ছাড়িয়ে নেবে কেন? কেনই বা হরিণীসম ক্ষিপ্রবেগে ধাবিত হবে সামনে?

ইন্দ্রনাথের সামনে পৌঁছেই নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুধু দুটি প্রশ্ন করেছিল তপতী। উপর্যুপরি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যেন দুটি ক্ষেপণাস্ত্র।

"কে গুলি করল? কার গায়ে লেগেছে?"

তপতীর গলার স্বর এখন পালটে গেছে। অব্যাখ্যাত যে বিস্ফোরণ ওর প্রতিটি অণু-পরমাণুকে চৌচির করে দিতে চেয়েছিল—এখন তা রনরনিয়ে তুলেছে ওর কণ্ঠস্বরকে। এ স্বর নারীকণ্ঠে যখন জাগ্রত হয়, তখন বনের বাতাসও থমকে দাঁড়ায়, মর্মরধ্বনিও বোবা হয়ে যায়, ঝিঁঝিপোকারা ডাকতে ভুলে যায়।

বনাঞ্চল তাই বুঝি সহসা এত নিস্তব্ধ।

টুঁটিটেপা নৈঃশব্দ্য। ক্ষণেকের।

খুব আস্তে বললে ইন্দ্রনাথ—"তপতী, আর এগিও না।"

ডানা ঝটপটিয়ে একটা নিশাচর খেচর উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। একটা কর্কশ ডাক শিহরিত করল শব্দহীন অরণ্যকে।

এক লহমা গেল এই ভাবে।

তারপর...প্রায় ফিস ফিস স্বরে...যেন বুকের বাতাসকে শব্দের রূপ দিয়ে বললে

তপতী—"বাবা?"

"বেঁচে নেই।"

তপতী স্থির। স্বরধ্বনিও নতুন মোড় নিয়েছে। শান্ত। তিরোহিত হয়েছে উত্তালতা।

"কার গুলিতে?"

"ভীমকুমারের।"

জেনারেটর চালু ছিল। অথচ শব্দ নেই বললেই চলে। উজ্জ্বল আলোয় ঘরের আনাচে কানাচে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। চকচক করছে বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিল, গদিমোড়া পিঠউঁচু রিভলভিং চেয়ার আর ইস্পাতের ধূসর আলমারি।

এ ঘরের প্রথম দর্শনীয় বস্তু টেবিলটা। আধখানা চাঁদের মতন আকৃতি। সেই মাপের পুরু কাচ দিয়ে ঢাকা। তলায় কুচকুচে কালো সানমাইকা।

ফলে, গোটা টেবিলটা [illegible]টা দর্পণ। অর্ধচন্দ্রাকৃতি মুকুরে প্রতিফলিত হয়ে চলেছে মাথার ওপরকার সিলিং আর ঝাড়বাতি। দুটোই বাদশাহী জলুস ঠিকরে দিচ্ছে। এমন সুন্দর সিলিং আমির ওমরাহর ঘরেই দেখা যায়। এমন বাহারি ঝাড়বাতি জলসাঘরেই মানায়।

দর্শক তাই বিমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে টেবিলের ওপর তাদের প্রতিফলনের দিকে। কালো কাচের বুকে সে এক মায়াময় দৃশ্য।

এই মুহূর্তে কিন্তু মুগ্ধকর এই দৃশ্যের দিকে কারোরই চোখ নেই। সবার আগে ঘরে ঢুকেছিল ইন্দ্রনাথ। সে এখন সরে দাঁড়িয়েছে পাশে। তার পেছনে এসেছিল অবিচল। ডাকাবুকো অবিচল। কৃষ্ণ-মুকুরের ওপর স্থাপিত মুণ্ডুটি দেখেই সে পেছন ফিরে তাকিয়েছিল।

তপতী ছিল পেছনে। সে আর ঘরে ঢোকেনি। চৌকাঠেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রখর বিদ্যুৎবাতি স্পষ্টতর করে তুলেছে তার ঈষৎ নাসিকাকুঞ্চন আর আড়ষ্ট অধর। বিপুল কান্নার আবেগ বন্যার মতোই তার পেশী সংযম ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইছে—কিন্তু আশ্চর্য মনোবল দিয়ে সে নিজেকে ধরে রেখে দিয়েছে। তবে অবাধ্য বুক কোনও বাধাই মানছে না। কনুই থেকে বেঁকিয়ে বাঁ হাত দিয়ে সে ধরে রেখেছে চিবুককে। অনামিকায় চিকমিক করছে সোনা আর টেরাকোটায় মেশানো আংটি। একই

ডিজাইনের নেকলেসের উত্থান পতন ঘটছে পীবর বুকের ওপর। হলুদ রঙের হাফ-হাতা কুর্তার নিচে যেন প্রলয় চলেছে। ফ্যাশন জগতে এখন আবার মিনির হাওয়া বইছে বলে দেখা যাচ্ছে খাটো কুর্তার নিচে উরু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত নিটোল পদযুগল কামড়ে রয়েছে ডাল-পাতার নকশা আঁকা গোলাপি পরিধেয়। বৃক্ষশাখার মতোই একটি পা বেঁকে গেছে—শরীরের ভর বুঝি সইতে পারছে না। চক্ষু বিস্ফারিত। পিঙ্গল তারারন্ধ্র স্পষ্টতর। টেবিলের কৃষ্ণমুকুরে পড়ে থাকা নরমুণ্ডের পূর্ণ প্রতিলিপি পাঠিয়ে দিচ্ছে মনের মুকুরে।

নিমাই সান্যালের শুধু মুণ্ডটাই দেখা যাচ্ছে টেবিলের ওপর—ধড়টা অদৃশ্য টেবিলের তলায়। তবে মুণ্ডের অবস্থান দেখেই ধড়ের অবস্থা কল্পনায় আনা যায়।

ধড় এখন প্রাণহীন।

তাই মুণ্ড গাল পেতে শুইয়ে রেখে দিয়েছে নিজেকে। তাই চোখের পাতা নেমে রয়েছে নিচে। কালনিদ্রা না হলে মানুষের মুণ্ড এভাবে নিজেকে শায়িত রাখে না।

টেবিল ঘুরে গেলে অবশ্য দেখা যাবে ধড়ের বর্তমান দৃশ্য। একটু আগেই টেবিল প্রদক্ষিণ করে এসেছে ইন্দ্রনাথ। দেখেছে, বুক ভেসে যাচ্ছে লোহিত রুধিরে। শোণিত-স্রোতে সিক্ত হয়েছে পাঞ্জাবি আর ধুতি। লাল প্রবাহের আবির্ভাব ঘটেছে বুকের একটা ছোট্ট ছিদ্র থেকে। ছিদ্রটাকে রচনা করেছে ভীমকুমারের বুলেট। বুকের বাম অঞ্চলে। নিখুঁত নিশানায় ঠিক হৃৎপিণ্ডের ওপর।

এ দৃশ্য দেখবার আগ্রহ ছিল না তপতীর। তাই দাঁড়িয়েছিল চৌকাঠে। মনের চোখে নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করেছিল। তাই নিজের শরীরকে আর বাগে রাখতে পারছিল না।

টলছে। তপতী টলছে। সেদিকে এক পা এগিয়ে গেল অবিচল।

থুতনি থেকে হাত সরিয়ে নিল তপতী। প্রসারিত করল অবিচলের দিকে। ঝিলিক দিয়ে উঠছে অনামিকার কাঞ্চন অঙ্গুরীয়। গোটা অবয়বের প্রতিবাদ বুঝি মুখর হলো ওই ঝিলিকের মধ্যে।

নিশ্চল হয়েছে অবিচল।

বললে—"তপতী।"

শায়িত মুণ্ডকে উদ্দেশ করে বলে গেল তপতী সঘন নিশ্বাসেঃ

"জানতাম। আমি জানতাম। ঠিক এইটাই ঘটবে। এ ফাঁদ থেকে কেউ জ্যান্ত বেরোতে পারে না। এবার আমার পালা।"

শেষের দিকে গলা বুঁজে এল তপতীর। বুকের সমস্ত শক্তি বুঝি ফুরিয়ে গেল এই কটি কথা বলতে গিয়ে। মনের শক্তিও নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। বিহ্বল বিড়ালাক্ষি চাহনির মধ্যে তা প্রতিভাত হচ্ছে।

খুব মৃদু, খুব স্পষ্ট, অতিশয় সমবেদনা নিবিড় স্বরে বললে ইন্দ্রনাথ—"শুধু তোমার নয়, তপতী। আমাদেরও।"

যে চাহনিকে এতক্ষণ ধরে চুম্বকের মতো টেনে ধরেছিল শায়িত মুণ্ড, এবার তা বিমুক্ত হলো এই অদৃশ্য আকর্ষণ থেকে। ধীরে ধীরে ঘুরে গেল ইন্দ্রনাথের দিকে।

যে চোখের দামিনী-নৃত্য দেখলে আকাশের বিদ্যুৎও ম্লানবদন হয়—সেই চোখে এখন বৃষ্টির আভাস দেখা দিয়েছে। থিরথির করে কাঁপছে মুখের পেশী। বাঁধ ভাঙতে চলেছে।

দু'ফোঁটা বৃষ্টি নেমে এল দু'চোখ বেয়ে।

"বেশি জেনে ফেলেছেন বলে?"

"হ্যাঁ।"

"কারবারটা কী?"

"এসো দেখাচ্ছি।"

ইস্পাত আলমারির পাল্লা খুলেই রেখে গেছিল ইন্দ্রনাথ। ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সারি সারি ফাইল, হিসেবের খাতা, ভাউচারের তাড়া।

বন্ধ রয়েছে শুধু মাঝের লকারটা। চাবি ঝুলছে ফোকরে।

টেনে খুলল ইন্দ্রনাথ।

কিছু নেই ভেতরে। বিলকুল ফাঁকা।

তা সত্ত্বেও ভেতরে হাত ঢুকিয়েছে ইন্দ্রনাথ। তর্জনী রেখেছে নিচের কোণে—বাঁদিকে। একটু চাপ দিতেই খুট করে একটা আওয়াজ।

লকারের পেছনের দেওয়াল ঢিলে হয়ে গেছে। তলার দিকটা ঠেলে এসেছে সামনের দিকে। আধ ইঞ্চির মতো। ফাঁকে আঙুল ঢুকে যায়।

এই ডালাই টেনে তুলল ইন্দ্রনাথ। এখন দেখা যাচ্ছে গোপন খুপরি আর তার ভেতরকার রহস্য।

থরে থরে সাজানো রয়েছে নোটের বাণ্ডিল। কড়কড়ে নতুন।

চৌকাঠ থেকে দু'পা ভেতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল তপতী। প্রাণহীন দেহটা বুঝি অদৃশ্য প্রাচীর তুলে দিয়েছে সামনে। টেবিলের দিকেও সে তাকাচ্ছে না—চাহনি আটকে রয়েছে খুপরির মধ্যে। যেখান থেকে নোটের একটা তাড়া টেনে আনছে ইন্দ্রনাথ।

একশ টাকার নোটের বাণ্ডিল। এই একটা তাড়াতেই রয়েছে দশ হাজার।

আর একটা বাণ্ডিলে টান দিয়েছে ইন্দ্রনাথ। এটা পাঁচশ টাকার নোটের বাণ্ডিল। পঞ্চাশ হাজার টাকা রয়েছে এই বাণ্ডিলে।

এবার বেরোলো বিশ হাজার টাকার বাণ্ডিল। কুড়ি টাকার মসৃণ মোলায়েম ঝকঝকে নোট।

দেখলেই হাতে নিতে ইচ্ছে যায়। কাছছাড়া করতে মন চায় না। নতুন নোটের এমনই আকর্ষণ।

তপতীর চোখে-চোখে চেয়ে বললে ইন্দ্রনাথ—"আন্দাজে বলতে পারো কত আছে এখানে?"

তপতী নিশ্চুপ। আড়ষ্ট চাহনি নিক্ষেপ করে রেখেছে ইন্দ্রনাথের হীরক-চক্ষুর ওপর। সদা-শান্ত গোয়েন্দার চোখের গভীরে এখন ঝিলিক দিচ্ছে কঠিনতম বস্তু।

চাহনি কঠিন হলেও কণ্ঠস্বর এখনও কোমল।

বললে—"প্রায় দশলাখ।"

এতক্ষণে কথা ফুটল অবিচলের বোবা বাকযন্ত্রে—"জাল?"

"বিলক্ষণ।"

পরক্ষণেই ফের হতবাক হয়ে যেতে হলো বাকপটু অবিচলকে। মাঠেঘাটে সে কাজ করে। অষ্টপ্রহর অনেক চমক দেখে অভ্যস্ত তার জীবনপ্রবাহ।

কিন্তু এবার যে চমক উদ্‌ঘাটিত হলো বিস্ফারিত চক্ষুযুগলের সামনে, তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না তার স্নায়ুমণ্ডলী।

সাজানো নোটের তাড়াগুলোকে দু'পাশে সরিয়ে দিচ্ছে ইন্দ্রনাথ। দুদিকে নোটের স্তূপ—মাঝে সরু সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গের শেষে আবার একটা দেওয়াল। ইস্পাতের কি কাঠের ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

খুব ছোট্ট একটা হাতলও দেখা যাচ্ছে ক্ষীণ আলোয়।

ইন্দ্রনাথ এই হাতল ধরে ডাইনে মোচড়

দিয়ে সামনে ঠেলে দিয়েছে।

দেওয়াল হেলে পড়ল পেছনে। ও পাশে আলো।

বিড়বিড় করে বললে অবিচল—"লকারের পেছনে ফুটো?"

"হ্যাঁ," ইন্দ্রনাথের জবাব।

"কি রয়েছে দেখতে তো পাচ্ছি না।"

"মাছের আড়ৎ।"

"মাছের আড়ৎ! অফিস আর আড়তের মধ্যে সুড়ঙ্গ—লকারের মধ্যে দিয়ে। তপতী, তুমি আগে দেখনি?"

ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নাড়ল তপতী। সে দেখেনি। এই প্রথম দেখল বলেই কথা বলতে পারছে না, অথবা বলতে চাইছে না।

"আপনি জানলেন কিভাবে?"

অবিচলের প্রশ্ন। ইন্দ্রনাথকে।

ইন্দ্রনাথের জবাবে যেন একটা সিনেমা-দৃশ্য ভেসে গেল তপতী অবিচলের চোখের সামনে দিয়ে...

অবিচলকে ঠেলে এগিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ।

তপতী ব্রীজে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারদিকে গভীর জঙ্গল। এতটুকু ভয় নেই। অথবা বোধহয় এ মেয়েকে বনের প্রাণীরাও ভয় পায়। সমীহও করতে পারে।

অথবা প্রশংসা। রূপের। সৌন্দর্য এমনই জিনিস।

অবিচল মার্জার চরণে এগোচ্ছে সেই রূপসী ছায়াময়ীর দিকে। অরণ্যের অন্ধকার যাকে ঘিরে রেখে দিয়েছে। হয়তো লক্ষ চক্ষু মেলে তার রূপসুধা পান করে চলেছে।

করুক। ইন্দ্রনাথ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়েছিল সেদিকে। গাছের অন্ধকারে যখন অবিচলের ছায়াকায়া আর দেখা গেল না—তখন অগ্রসর হলো নিজের লক্ষ্য অভিমুখে।

লক্ষ্য তার মাছের আড়ৎ। কিন্তু নদী পেরোবে কি করে? ব্রীজের ওপর দিয়ে অবশ্যই নয়। কপোত-কপোতীরা ইতিমধ্যেই গুঞ্জন শুরু করে দিয়েছে সেখানে। ব্রীজের নিচে দাঁড়িয়েই শোনা যাচ্ছে মূর্তিমান আর মূর্তিমতীর বাক্যুদ্ধ। বড় উপভোগ্য সেই কথার লড়াই।

কিন্তু রঙ্গরসে এখন মন নেই ইন্দ্রনাথের। কুলকুল করে নদী বয়ে চলেছে পায়ের তলা দিয়ে। হেঁটে পেরিয়ে যাবে? সমীচিন হবে না। স্টীমার যায় এই জলে। জল গভীর।

সাঁতরাবে? মন চাইছে না। গরদের পাঞ্জাবি আর চুনোট করা ধুতির পরিণামটা কল্পনা করেই বিরূপ হয় মন। তাহলে?

গুজগুজ ফিসফাস করে কথা বলে চলেছে তপতী আর অবিচল ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে। ব্রীজের নিচে মোটা মোটা কংক্রিটের বীম। এ-পাড় থেকে ও-পাড় পর্যন্ত।

মনস্থির হয়ে যায় ইন্দ্রনাথের। আস্তিন গুটিয়ে নেয় পাঞ্জাবির। কোঁচার প্রান্ত পকেট থেকে বের করে গুঁজে নেয় কোমরে। পাঠক এখন দেখতে পাচ্ছেন তার বাহুর গুলি-গুলি পেশী। নরম গরদ দিয়ে স্ফীত এই মাসলকেই ঢেকে রেখে দেয় ইন্দ্রনাথ রুদ্র। তাই তাকে মনে হয় শিল্পী অথবা কবি। নবনীত কোমল এহেন তনু তো নির্জীব বঙ্গসন্তানকেই মানায়।

রাতের অন্ধকারে কিন্তু স্বরূপ দেখাচ্ছে বাঙালি গোয়েন্দা। যাঁরা বিলিতি ক্রাইম নভেল পড়ে পোক্ত, তাঁরা ভাবছেন বুঝি—এ তো বিদেশি ছায়ার অ্যাডভেঞ্চার।

কিন্তু বিদেশিদের বহু ক্ষেত্রেই বঙ্গসন্তান এখন ঈর্ষণীয়।

গোয়েন্দাগিরির ক্ষেত্রেও। ভুলে যাবেন না, ফিংগারপ্রিন্টের বিজ্ঞান এই পলিমাটির দেশ থেকেই বিলেতের মাটিতে পৌঁছেছে।

পদচিহ্ন দেখে অনুসরণ অর্থাৎ ট্র্যাকিং সাহেবরা শিখেছে ভারতের খোঁজী সম্প্রদায়ের কাছে। এরাই ছিল সেকালের ডিটেকটিভ। এখনও এদের পাবেন নদীয়া জেলায়। ভারতের আরও কয়েক জায়গায়।

ইন্দ্রনাথ তার বিদ্যে রপ্ত করেছে এই ভারতীয় গুপ্ত গুরুদের কাছ থেকেই। তাই কংক্রিটের বীম ধরে তাকে ঝুলতে দেখে অবাক হবেন না। এই মুহূর্তে সে ওরাংওটাং। যদিও পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবি। অঙ্গ ঘিরে ল্যাভেন্ডারের সুবাস।

আর এই সুবাসই হয়েছিল তার কাল। ঘটিয়েছিল বিষম বিপদ। সে প্রসঙ্গ আসছে যথা সময়ে।

নদী পেরিয়ে এসেছে মানুষ-ওরাংওটাং। অনেক দিন পর পুরো বডিখানাকে দুই বাহুর পেশীর ওপর ছেড়ে দিয়ে বেশ উৎফুল্লও হয়েছে নিশাচর গোয়েন্দা। ধমনীর রক্তপ্রবাহ এখন আর ধীরগতি নয়।

এরপর বনপথ। তমিস্রায় ঢাকা সরু গলি। আড়ৎ।

ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। বিদায় নিয়েছে কাজের লোকরা।

একটা একটানা খুব চাপা আওয়াজ ভেসে আসছে টিনের শেডের দিক থেকে। জেনারেটর চলছে। এই কারণেই পেট্রলও থাকে গুদোমে।

আলো ঠিকরে আসছে অফিস ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে। আলো জ্বলছে আড়ৎ ঘরেও।

অথচ চত্বর নির্জন। কাকপক্ষীও নেই।

জঙ্গলের কিনারায় গাছের ঘুপসি অন্ধকারে মিশে রয়েছে ইন্দ্রনাথ। শাণিত চক্ষু ঘুরছে প্রাঙ্গণের সর্বত্র। সেই সঙ্গে ইলেকট্রনিক স্পীডে কাজ করছে মস্তিষ্ক।

দিবালোকে এইখানেই দেখা গেছিল কর্মচাঞ্চল্য। এখন তা নিষ্প্রাণ। জনহীন।

এইটাই তাহলে রেওয়াজ। রহস্যনিবিড় এই প্রাঙ্গণ সন্ধ্যার আঁধার নামলেই হবে নির্জন। 'জগন্নাথ ফিশারিজ সিন্ডিকেটে' তখন প্রহরায় রত থাকছে শুধু বোবা গাছপালা।

অন্ধকারে মাথা উঁচু করে রয়েছে দোতলা বাড়িটা। নিষ্প্রদীপ অবস্থা সেখানেও। তপতী না হয় সেতুর ওপর প্রণয়ালাপে তন্ময়। কিন্তু তার পিতৃদেব? নিমাই সান্যাল? তিনিও নেই দ্বিতল কোঠায়?

তাহলে আছেন অফিস ঘরে। অথবা আড়ৎ ঘরে। যেখানে বিদ্যুৎবাতি রোশনাই বিতরণ করছে পরমানন্দে।

অতএব ওই দিকেই যাওয়া যাক। অমানিশার অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে ক'জন ওখানে জমায়েত হয়েছে—কি কর্মে লিপ্ত—উঁকি মেরে দেখা যাক।

যদিও প্রাঙ্গণ ফাঁকা—তবুও প্রতি পদক্ষেপে চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে গেছিল ইন্দ্রনাথ। সাবধানের মার নেই। কে কোথায় ঘাপটি মেরে পাহারা দিচ্ছে কে জানে। তবে সে যদি সঞ্চরমান হয়, ইন্দ্রনাথের ব্যাঘ্রচক্ষুর অগোচরে থাকবে না।

না। কোনও ছায়াই নড়ে উঠল না কোথাও। ইন্দ্রনাথও নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেল আড়তের সামনে।

টিনের শেডের দরজা ভেজানো। ইঞ্চি দুয়েক ফাঁক রয়েছে দুই পাল্লার মাঝে।

ইন্দ্রনাথ চোখ রাখে সেখানে।

সবুজ লরী দাঁড়িয়ে আছে পার্টিশনের গা ঘেঁষে।

একদম গা ঘেঁষে। এক ইঞ্চি ফাঁকও নেই।

এক দৃষ্টে সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে ইন্দ্রনাথ। ভাবছে। ভুরু ঈষৎ কুঞ্চিত। ললাট আর মসৃণ নয়।

পার্টিশনের গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়াতে লরীকে নিশ্চয় বিলক্ষণ কসরৎ করতে হয়েছে।

কিন্তু কেন? প্রচুর জায়গা রয়েছে। যেখানে হয় দাঁড় করালেই তো হতো।

দূরায়ত পত্রমর্মর ছাড়া আর কোনও শব্দ তো কানের পর্দায় আছড়ে পড়া উচিত নয়। নদীর কলধ্বনিও আসছে না এতদূরে। অথচ...

একটা ক্ষীণ খুচ-খুচ-খুচ শব্দ-লহরী ধাক্কার পর ধাক্কা মেরে চলেছে কর্ণেন্দ্রিয়তে।

শব্দের উৎস জানবার জন্যে এদিকে-ওদিকে কান ঘোরাচ্ছে ইন্দ্রনাথ। রাডারের মতোই শব্দ সংগ্রহ করে সূচ্যগ্র করে আছড়ে ফেলছে কর্ণপটহে।

উৎসটাকেও এখন আন্দাজ করা যাচ্ছে।

না। ভুল হয়নি ইন্দ্রনাথের। সবুজ তেরপল টান-টান করে বাঁধা রয়েছে লরীর ওপর। শব্দ জাগ্রত হচ্ছে এই তেরপলের তলদেশ থেকে।

আশ্চর্য! বাঁধা তেরপলের তলায় একনাগাড়ে এরকম আওয়াজ হয়ে চলেছে কেন? মেশিন চলছে নাকি?

উদগ্র হয় ইন্দ্রনাথের কৌতূহল। প্রহেলিকার সমাধান না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছে না।

তাই নিতে হলো একটু ঝুঁকি। সামান্য।

ভেজানো পাল্লায় চাপ দিল খুব আস্তে। যাতে আর্তনাদ না করে কব্জা।

পা দিল আড়তের ভেতরে। চকিতে চোখ বুলিয়ে নিল চারদিকে। কেউ নেই।

গেল লরীর সামনে। খুলে ফেলল তেরপলের একদিকের বাঁধন। উঁকি দিল ভেতরে। কিন্তু নিষ্ফল হলো প্রচেষ্টা। কিছুই নেই তেরপলের তলায়। বিলকুল ফাঁকা। তবে হ্যাঁ, আওয়াজটা জোরতর হয়েছে। পুরো মুণ্ডুখানা তেরপলের তলায় ঢুকে থাকায় খুচ-খুচ-খুচ-খটাস-খট আওয়াজের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুণ্ড টেনে নেয় ইন্দ্রনাথ। মুখভাব এখন বিমূঢ়। শূন্য তো শূন্যই—সেখানে কি শব্দ সৃষ্টি হতে পারে? কাঠের বাক্সও নেই লরীতে।

অথচ শব্দটা এখনও হয়ে চলেছে। ভৌতিক কাণ্ড নাকি? নিঝুম নিস্তব্ধ এই অমাবস্যার রাত্রে কি আসরে অবতীর্ণ হয়েছে অশরীরীগণ?

পা টিপে টিপে বাইরে বেরিয়ে আসে ইন্দ্রনাথ। এবার উঁকি দেওয়া যাক অফিস ঘরে।

কিন্তু এ ঘরের দরজা তো ভেজানো নেই। বন্ধ। ভেতর থেকে।

বন্ধ রয়েছে পাশের জানলাও। পর্দা টানা।

নিমেষে গোয়েন্দাপ্রবরের চোখ চলে

গেছিল ওপরে—যেখানে রয়েছে ঘুলঘুলি—যেখান থেকে আলোকরশ্মি তির্যক রেখায় ধেয়ে যাচ্ছে অরণ্যের অন্ধকারের দিকে।

সেইদিকেই ধাবিত হয়েছিল ইন্দ্রনাথের বপু। কিভাবে?

বাক্সের ওপর বাক্স সাজিয়ে। প্রাঙ্গণের হেথায় হোথায় বিক্ষিপ্ত ছিল বিস্তর কাঠের বাক্স। মাছের চালান যায়। এখন খালি।

তারার আলোয় ইন্দ্রনাথের শ্বাপদ চাহনি লেহন করে এসেছিল দারুময় পেটিকাগুলোকে। একে একে এনে সাজিয়েছিল ঘুলঘুলির তলায়। তারপর সন্তর্পণে উঠে গেছিল সর্বোচ্চ বাক্সের শীর্ষদেশে।

ঘুলঘুলি এখন চোখের সামনে। সেই সঙ্গে ঘরের দৃশ্য।

পাল্লা খোলা আলমারির। খোলা লকারের পাল্লাও। ভেতরের গোপন খুপরির ডালাটা অত উঁচু থেকে চোখে পড়েনি ইন্দ্রনাথের।

কিন্তু যা চোখে পড়ছে, চক্ষু-তারকাকে বিস্ফারিত করার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

তাড়া তাড়া আনকোরা নোট। খুপরির ভেতর দিকে ঠেলে দিচ্ছে ভীমকুমার। খচ-খচ-খটাস-খট শব্দে চলে যাচ্ছে আরও ভেতরে—ফিরে আর আসছে না।

নিমাই সান্যাল পাশেই দাঁড়িয়ে। হাতে একটা কাগজ। নিশ্চয় নম্বরী নোটের লিস্ট। টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত নোটের গাদা থেকে একটা করে বাণ্ডিল তুলছে, লিস্টের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছে নম্বর, তুলে দিচ্ছে ভীমকুমারের হাতে। ভীমকুমার পাচার করছে লকারের উদরে।

উদর থেকে যাচ্ছে কোথায়?

আড়তে দাঁড়িয়ে যে খচ-খচ-খচ শব্দ শুনে বিমূঢ় হয়েছিল ইন্দ্রনাথ, ঘুলঘুলিতে চোখ লেপটে থেকে শুনছে সেই একই শব্দ।

নিমেষে পরিষ্কার হয়ে যায় শব্দরহস্য। মনের চোখে ভেসে ওঠে পার্টিশনের ওদিকের দৃশ্য। সবুজ লরী। পার্টিশন! মাঝে কোনো ফাঁক নেই।

লরী যেখানে দাঁড়িয়ে, তার গা ঘেঁষেই রয়েছে নিচের আলমারি। মাঝে ওই পার্টিশন।

ফোকর রচনা করা হয়েছে পার্টিশনের গায়ে। ফোকর রয়েছে লকারের উদরেও। নোটের বাণ্ডিল লাইন দিয়ে লাগোয়া এই দুই ফোকরের মধ্যে দিয়ে পড়ছে...

লরীর পেটে। অবশ্যই গোপন খুপরিতে। তেরপল চাপা থাকায় নোট দেখতে পায়নি ইন্দ্রনাথ—শুনেছে আওয়াজ।

বনস্থলীও বুঝি চঞ্চল হয়েছিল গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়ায়। নীরব সাক্ষী থেকেছে এতকাল।

আর নীরবে থাকতে পারেনি। নিশ্চয় কানাকানি জুড়েছিল নিজেদের মধ্যে। যে বাতাস এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে ছিল পাদপশ্রেণীর মধ্যে, অকস্মাৎ সে-ও দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। মুখর হয়েছিল শব্দহীন বনভূমি—পত্রমর্মর যে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সেই সঙ্গে হাওয়ার ঝাপটা বয়ে এসেছিল আড়তের দিকে।

ভীমকুমার আর নিমাই সান্যালের ধ্যান-ভঙ্গ ঘটল কিন্তু অন্য কারণে। ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে জোর হাওয়া তো ঢুকবেই। যখন ঢোকে, তখন সোঁ-সোঁ করেই ঢোকে।

সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে পথের গন্ধকে।

এখন নিয়ে গেল ল্যাভেন্ডারের গন্ধ। ইন্দ্রনাথের অতি প্রিয় সুগন্ধি।

প্রথমে সচকিত হয়েছিল ভীমকুমার। নিজেও গন্ধ-বিলাসী নিশ্চয়। নইলে বাতাস-দূতের বয়ে আনা ফিকে সুগন্ধ তার নাকে ধরা পড়বে কেন? এ বিদ্যে তো থাকে গন্ধ-বিশারদদের।

বাতাস শুঁকেই থমকে গেছে ভীমকুমার। নোটের বাণ্ডিল হাতেই রয়েছে। সন্দিগ্ধ চাহনি ঘুরে গেছে নিমাই সান্যালের দিকে—"সেন্টের গন্ধ! লোকটার গায়ে ছিল!"

নিমাই সান্যাল যখন মনে করবার চেষ্টা করছে গন্ধটা ছিল কিরকম এবং বাতাস শুঁকে গন্ধের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টায় ব্যস্ত, ঠিক তখনি দ্বিতীয় প্রশ্ন ছুটে এল ভীমকুমারের দিক থেকে—"এ গন্ধ এখানে কেন? এই সময়ে?"

ইন্দ্রনাথ আর দাঁড়ায়নি। তড়িঘড়ি নেমে এসেছিল বাক্সের ওপর থেকে।

দুর্ঘটনাটা ঘটল তখুনি। ধুতি মহাশয় যে বাক্সের ইস্পাতের পটিতে আটকে গেছে—অত খেয়াল করেনি।

ফলে বাক্স-টাক্স সমেত অবতীর্ণ হলো ধরণীর বুকে এবং ক্যাঙারু লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল জড়ো করা কাঠের বাক্সের আড়ালে।

দুম-দাম-ধড়াম-ধাম আওয়াজ শুনে ভীমকুমার যখন দরজা খুলে বাইরে এসেছে—চত্বর তখন জনহীন। ভাবতেও পারেনি, মাত্র দশ হাত দূরে বাক্সের আড়ালে মাটি কামড়ে শুয়ে আছে নিশীথ অভিযানের নায়ক—ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

ক্ষণেকের জন্যে চেয়েছিল ঘুলঘুলির নিচের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাক্সগুলোর দিকে।

পরমুহূর্তেই ঠিকরে গেছিল অফিস ঘরের মধ্যে। ভেতর থেকে ভেসে এসেছিল নিমাই সান্যালের আকুল আর্তনাদ—"আমি না!...আমি না!"

"বিশ্বাসঘাতক!" দাঁতে দাঁত পিষে বলেছিল ভীমকুমার।

আর তারপরেই গুলির আওয়াজ। একবারই।

শুয়ে শুয়েই দেখল ইন্দ্রনাথ, তীরবেগে অফিসঘর থেকে বেরিয়ে আসছে ভীমকুমার। হাতে ধূমায়িত রিভলভার। পদাঘাতে দুহাট করছে আড়ৎ ঘরের দরজা। জাগ্রত হয়েছে লরীর গজরানি। ব্যাকগিয়ারে বাইরে বেরিয়ে এসেই চত্বরের ওপর দিয়ে ঘুরে গিয়ে উল্কাবেগে ধেয়ে গেল সরু পথের দিকে।

গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সেদিকেই দৌড়েছিল ইন্দ্রনাথ। যেতে যেতেই শুনেছিল পর-পর দু'বার পিস্তল নির্ঘোষের ধমকানি।

দুটো গুলি। তার রিভলভার থেকে যার গুলি ফসকায়নি। নিমাই সান্যালের কণ্ঠ তো নীরব হয়ে গেছে প্রথম গুলিবর্ষণের পরেই।

তাই চরণযুগল আর সামনে যেতে চায়নি। ফিরে গেছিল অফিস ঘরে। চকিতে দেখে নিয়েছে পিঞ্জরশূন্য নিমাই-কলেবরকে। নোটের তাড়া লকারে তুলে দেওয়ার আগে পেছনকার ডালা নিজেই বন্ধ করেছে।

বেরিয়ে এসেই গলা চড়িয়ে ডেকেছে—"অবিচল।"

কাহিনী শেষ করেই গলা নামিয়ে আনল ইন্দ্রনাথ—"শুনছো?"

হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে বটে। দূর থেকে এগিয়ে আসছে সেই শব্দ। বিচিত্র মিশ্র শব্দ। অনেকগুলো মোটর ইঞ্জিনের সম্মিলিত গর্জন। সেই সঙ্গে আর একটা শব্দ। অদ্ভুত শব্দ। ঠক-ঠক-ঠক-ঠক! শেষের শব্দ কিন্তু খুবই দ্রুত-পরম্পরায় ইঞ্জিন গর্জনের সঙ্গে মিলেমিশে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তাই চেনা যাচ্ছে না শব্দের স্বরূপ।

তপতী কিন্তু চিনেছিল। এই শব্দ সে চেনে। এই শব্দকে সে ভয় পায়। তাই নিমেষে রক্তহীন হয়ে গেল মুখ।

ইন্দ্রনাথ বলেছিল—"ওরা আসছে।"

"হ্যাঁ, ওরা আসছে," বিবর্ণ মুখে প্রতিধ্বনি তুলেছিল তপতী—"বাবার লাশ সরাতে। আর—"

"আর?" অবিচল লক্ষ্য করেছিল তপতীর সহসা বিবর্ণতা।

"আমাকে নিয়ে যেতে। জ্যান্ত।"

"কারণ?" খুব আস্তে টেনে টেনে বলেছিল অবিচল। চাহনি সরু হয়ে গেছে। এক দৃষ্টে চেয়ে আছে তপতীর চোখের দিকে।

চোখে চোখে তাকিয়েই ম্লান হাসল তপতী—"আমি যে তার ভাবী বউ।"

"ভীমকুমারের?"

"হ্যাঁ গো। ওই তো তার ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ।"

"ঘোড়া!"

আওয়াজটা এবার চিনেছে ইন্দ্রনাথ। টগবগ টগবগ ধ্বনিই বটে। গাড়ির আওয়াজের সঙ্গে মিশে থাকায় এতক্ষণ ছিল অপরিচিত।

চকিত হয় চাহনি—"ভীমকুমার ঘোড়ায় চেপে আসছে?"

"প্রায় আসে। বনের মধ্যে দিয়ে শর্টকাট করে।"

দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে অবিচলের—"আসুক," বলতে বলতে ইতিউতি চেয়ে ঘরের কোণ থেকে তুলে নেয় একটা খেঁটে লাঠি।

"মিস্টার রোমিও," গম্ভীর গলায় বললে ইন্দ্রনাথ—"বীরত্ব পরে দেখিও। এখন পালাও।"

বনের পথ চেনে তপতী। গাঢ় অন্ধকারেও তাই অসুবিধে হয়নি। আড়তে যখন স্তব্ধ হলো মিশ্র শব্দলহরী—এরা তখন অনেক দূরে। নদী পেরিয়েছে ব্রীজের ওপর দিয়েই। ফের ঢুকেছে জঙ্গলে।

আর ঠিক তখনি আবার জাগ্রত হলো অশ্বখুরধ্বনি। উল্কা বেগে ধেয়ে আসছে ব্রীজের দিকেই। শুধু ঘোড়াই আসছে—গাড়ি নয়।

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোড়সওয়ারও। ভীমকুমার।

শুনেই থমকে দাঁড়িয়েছিল অবিচল—কিন্তু তপতী নির্বোধ নয়। ক্ষিপ্রতর হতে চাইছে চরণ—কিন্তু অবিচল যে যেতে চায় না।

"চলে এস।"

"না।"

"বোকামি করো না—ওর হাতে রিভলভার আছে।"

"থাক। আমিও খেঁটে চালাতে জানি।"

ধমকে ওঠে ইন্দ্রনাথ—"অবিচল।"

কিন্তু গণ্ডারের গোঁ চেপেছে অবিচলের মাথায়। খেঁটে বাগিয়ে চেয়ে আছে রাস্তার দিকে—ব্যবধান মাত্র দশ হাত।

"অবিচল!" হাত ধরে টানে ইন্দ্রনাথ।

"ছাড়ুন। খেঁটের জোর এবার দেখুন।"

"পাগলামি করো না—"

"খেঁটে ছুঁড়বো এখান থেকেই—ঘোড়ার পায়ের ফাঁকে। এ বিদ্যে আমি জানি

ইন্দ্রনাথদা। দেখুন না।"

ঘোড়া তখন উঠে এসেছে ব্রীজের ওপর। অন্ধকার ভেদ করে ধেয়ে আসছে এক তাল জমাট অন্ধকার।

আর ঠিক তখনি তীব্র হ্রেষারবে থরথরিয়ে উঠল বনভূমি। চিঁহি চিঁহি ডাকে খান খান হয়ে যাচ্ছে নৈঃশব্দ।

কিন্তু থেমে নেই টগবগানি। চোখের পলকে পেরিয়ে এল ব্রীজ। কিন্তু রাস্তায় নামল না। জমাট অন্ধকার এখন ধেয়ে আসছে ঘাসের ওপর দিয়ে।

চাপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে ইন্দ্রনাথ—"ঘোড়া টের পেয়েছে! পালাও!"

আর পালাও! পলকও বুঝি এত দ্রুতগতি হয় না। ঘোড়া এসে গেছে। সামনেই দাঁড়িয়ে গেছে শিরপা হয়ে। সেই সঙ্গে কানের পর্দা ফাটানো চিঁহি চিঁহি ডাক।

মরিয়া হয়ে গেল অবিচল। খেঁটে ছোঁড়বারও আর সময় নেই। মাথার ওপর তুলেছিল ঘোড়ার পেছনের পায়ে মারবে বলে। মেরেও ছিল। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো অন্ধকারে।

পরমুহূর্তেই বুঝি দুরমুশ এসে পড়ল পাছায়। মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে, এইটুকুই শুধু মনে ছিল অবিচলের।

অন্ধকারেও চোখ চলে চতুষ্পদের। তাই শূন্য থেকে বজ্রের মতোই নেমে এসেছিল সামনের দুই পা। নির্ভুল লক্ষ্যে চোট মেরে ঠিকরে ফেলে দিয়েছিল ইন্দ্রনাথ আর অবিচলকে।

কিন্তু কেশাগ্রও স্পর্শ করেনি তপতীর। তাকে যে সে চেনে। পিঠে নিয়ে ঘুরেছে এই বনে। কতদিন। কতবার! ভীমকুমারের সঙ্গে।

॥ ৪ ॥

কবন্ধ রহস্য

নাক চুলকোচ্ছেন বিক্রম খান। এই পৃথিবী গ্রহে তিনি একটি দ্রষ্টব্য মনুষ্য। অনায়াসে টুরিস্ট আকর্ষণ হতে পারেন।

বিক্রম খান এই তল্লাটের আরক্ষা বিভাগের হর্তাকর্তা। অর্থাৎ পুলিশপ্রধান। তাঁর গাত্রবর্ণ মহিষকে ঈর্ষান্বিত করে, তাঁর বিপুল উদর শূকরের চক্ষু ছানাবড়া করে এবং তাঁর বিশাল আয়তন দেখে হস্তিশাবক খেলার সঙ্গী মনে করে ধেয়ে আসে। তিনি দাড়ি কামান তিন মিনিটে, কিন্তু গোঁফের পেছনে ব্যয় করেন পাক্কা একটি ঘণ্টা। ঈশ্বরের দেওয়া এই কেশগুচ্ছকে তিনি ফেলে দিতে নারাজ। কৈশোরে যখন প্রথম রোঁয়ার আবির্ভাব ঘটেছিল বিশেষ সেই অঞ্চলে—তখন থেকেই তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—প্রাণ যায় যাক, বিয়ে আটকায় আটকাক—গোঁফ তিনি বাড়িয়েই যাবেন।

বিয়ে সত্যিই আটকেছে। পঞ্চাশ বছরেও তিনি ব্যাচেলর। একে তো পুলিশের চাকরি করেন—যে পুলিশ ব্রিটিশ আমল থেকেই সাধারণ মানুষের কাছে বিভীষিকা—তার ওপর ওই গোঁফ—যা অনায়াসেই বাইসনের শিং-এর সঙ্গে তুলনীয়। বাঁকানো, ছুঁচোলো এবং ভয়ঙ্কর।

শুধু আকারে প্রকারেই বীভৎস নয়—বিকট এই গোঁফের বর্ণ-সুষমাও লক্ষণীয়। যেহেতু ভারিক্কি থাকবার প্রচেষ্টায় তিনি অষ্টপ্রহর চুরুট কামড়ে থাকেন—তাই তাম্রকূটের বিশ্রী ধোঁয়ায় কাঁচা চুল ঝলসেছে, পাকা চুল রঙ বদলেছে।

বউ না জোটার জন্যে বিন্দুমাত্র দুঃখিত নন বিক্রম খান। বরং তূরীয় আনন্দে থাকেন। অবলা জীবগুলো প্রাণে বেঁচে গেছে এই পেল্লায় বপুর সান্নিধ্যে না এসে—শেষকালে খুনের চার্জে পড়তে হতো।

বিপুল মেদভারে বিক্রম খানের হাঁটতে চলতে কষ্ট হয়। বোধহয় হরমোনের গোলমাল আছে। আহার করেন বিপুল পরিমাণে—হজমও করেন। শত্রুপক্ষ বলে, এঁর জন্যেই নাকি দেশে দুর্ভিক্ষ আসন্ন। এই মুহূর্তে তিনি লোলুপনয়নে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন খোসা-ছাড়ানো নুন-মরিচ মাখানো এক ডজন কলার দিকে। কারণ, এটা তাঁর প্রাতরাশের সময় এবং এই কাহিনী তাঁকে নিয়ে যখন নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে, তখন তিনি তাঁর অফিস কক্ষে আসীন রয়েছেন। যে চেয়ারে বসে আছেন, সেটাকে চৌকি বলাই সঙ্গত। সেখানে একটা বাচ্চা হাতিকে বসিয়ে দিলেও তার জায়গা কুলিয়ে যাবে।

মস্ত টেবিলের ওপর তাঁর একখানা গদা-হস্ত প্রসারিত করে রেখেছেন। এই হাতে ধরে রেখেছেন প্রকাণ্ড চুরুট—অপর হাতে নাক চুলকোচ্ছেন—পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই তা বলা হয়েছে।

অবাক হয়ে এহেন মানুষ-হাতিকে নিরীক্ষণ করছিল অবিচল। তার অবস্থা শোচনীয়। ঘোড়ার চাট তার কোমরকে বেশ জখম করেছে। পাছায় পদাঘাত করে মুখ থুবড়ে ফেলে দিয়েছিল বলেই রক্ষে—নইলে নির্ঘাৎ হাড় ভাঙতো।

ইন্দ্রনাথও ঘোড়ার মার খেয়েছে। একই জায়গায়। পশ্চাৎপ্রদেশে। তাকেও বেঁকে বসে থাকতে হয়েছে।

অষ্টাবক্র এই দুই মূর্তির অবস্থা দেখে প্রথমে বিলক্ষণ কৌতুক অনুভব করেছিলেন বিক্রম খান। কদলী ভক্ষণও বিস্মৃত হয়েছিলেন। অভিজ্ঞতা শোনবার পর এখন গম্ভীর হয়েছেন এবং নাসিকা কণ্ডূয়ন করছেন।

অবশেষে বললেন—"ব্র্যাভো। এই অবস্থায় স্কুটার চালিয়ে আসতে পারলেন?"

পাঠক নিশ্চয় চমকে উঠলেন বিক্রম খানের অবিস্মরণীয় কণ্ঠস্বর শুনে। চমকানো আপনার উচিত হয়নি। শুরুতেই বলেছি, বিক্রম খান এই গ্রহের টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন হতে পারেন। আর কিছুর জন্যে না হলেও, শুধু ওই গলাখানার জন্যে। মানুষের গলায় গাধার ডাক শোনবার সৌভাগ্য ক'জনের হয়?

ঈশ্বর প্রায়ই অপরূপ সৃষ্টি করে বসেন। বড় খেয়ালি ব্যক্তি। সাগরতলের আগ্নেয়লাভা খেয়ে বেঁচে আছে চক্ষুহীন এক জীব—এমন সংবাদও শোনা যাচ্ছে। তাহলে মানুষের গলা দিয়ে গাধার ডাক বেরোবে না কেন?

সুতরাং আর চমকাবেন না।

ইন্দ্রনাথ হাতঘড়ি দেখে বললে—"দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

বিক্রম খান বললেন—"কিসের দেরি?"

"ভীমকুমার সরে পড়তে পারে।"

"সরে পড়েছে।"

বেঁকা শিরদাঁড়া সিধে হয়ে গেল ইন্দ্রনাথের। অবিচলেরও।

বিক্রম খান চুরুট কামড়ালেন—তাঁর নাক এখন চুলকোচ্ছে না। কিন্তু চুরুট যে নিভে গেছে। এদিকে পাকা কলার সৌরভেও রসনা সিক্ত হয়েছে। অতএব তিনি চুরুট রেখে দিয়ে একটা কলা তুললেন। আধখানা কামড়ে চিবোতে লাগলেন। অর্ধনিমীলিত নয়নে নিরীক্ষণ করে গেলেন বিধ্বস্ত দুই মূর্তিকে।

ঘড়ির ঘূর্ণমান কাঁটার দিকে ফের চোখ ফেরায় ইন্দ্রনাথ। এক-একটা সেকেন্ড এক-একটা সুযোগকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অসহ্য!

বিক্রম খান সকৌতুকে লক্ষ্য করলেন ইন্দ্রনাথের উৎকণ্ঠা। কিঞ্চিৎ উপভোগও করলেন। কোঁৎ করে কলার পিণ্ড গিলে নিলেন।

বললেন রাসভ-রাগিণীতে—"ভীমকুমার আর নেই।" বলেই শিবনেত্র হলেন। ভুরু এবং চোখ নাচিয়ে ঊর্ধ্বলোক দেখালেন। ফের বললেন—"খুন।"

"খুন! ভীমকুমার?" ইন্দ্রনাথের গলা নেমে এসেছে খাদে।

"আজ্ঞে," বলে গোদা হাতের পাঞ্জা দিয়ে নিজের গলায় কোপ মারলেন বিক্রম খান—"পাঁঠাবলি—ধড় আছে, মুণ্ড নেই।"

ঘর নিস্তব্ধ। দুই ভিজিটরকে বাক্যহারা করে দিতে পেরে বিলক্ষণ তৃপ্ত বিক্রম খান। ঝট করে আর একখানা কলা উদরস্থ করে নিলেন।

আস্তে আস্তে বললে ইন্দ্রনাথ—

"তপতী?"

"নেই।"

অবিচলের মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেছে। গত রাতে ঘোড়ার পদাঘাতে মুহ্যমান হয়েছিল অল্পক্ষণের জন্যে। ইন্দ্রনাথের ঝাঁকুনিতেই সম্বিৎ ফিরে পায়। শোনে সেই দুঃসংবাদঃ তপতীকে ঘোড়ায় চাপিয়ে চম্পট দিয়েছে ভীমকুমার।

এখন শোনা গেল তার চাইতেও বড় দুঃসংবাদ। ভীমকুমার খতম। তপতী নেই।

"নেই...মানে?" ক্ষীণ প্রশ্ন জাগ্রত হয় অবিচলের শুষ্ক কণ্ঠে।

অনুকম্পার চোখে তার দিকে তাকালেন বিক্রম খান। ইচ্ছে ছিল আর একটা কলা তুলে নেওয়ার। কিন্তু ছেলেটার করুণ মুখচ্ছবি দেখে পাষাণও বুঝি গলে।

বললেন যথাসম্ভব কোমল রাসভ-রাগিণীতে—"নেই মানে নেই.... মানে," শূন্যে পাঁচ আঙুল ঘুরিয়ে—"হাওয়া।"

ঢোক গিলল অবিচল। কি বলা উচিত, ভেবে পাচ্ছে না।

ঈষৎ কঠিন গলায় ইন্দ্রনাথ বললে—"সময় বয়ে যাচ্ছে। হেঁয়ালির অর্থ প্রাঞ্জল করে দিলে সুখী হব।"

এতক্ষণে চক্ষু বিস্ফারিত হলো বিক্রম খানের। কাষ্ঠাসনে নড়ে উঠল তাঁর বিপুল কলেবর—"কি বললেন?"

'প্রাঞ্জল' শব্দটার মানে বোধহয় বোঝেননি।

ইন্দ্রনাথ শক্ত গলাতেই বলে গেল—"তপতী কোথায়?"

"নিখোঁজ।"

"বেঁচে আছে?"

"আল্লা-যিশু-কৃষ্ণ জানেন।"

"খুলে বললে খুশি হব।"

"কত খুলে আর বলব? সাঁট বোঝেন না? কিসের ডিটেকটিভ আপনি? আজ সকালেই খবর পেয়ে লোক পাঠিয়েছিলাম। ভীমকুমারের মুণ্ড নেই—শুধু ধড় পড়ে আছে। কাল রাতে একটা মেয়েকে ধরে এনেছিল। রেপ-টেপ করেছিল বোধহয়। খুনী তাকে নিয়েই পালিয়েছে।"

"খুনী কে?"

"আল্লা-যিশু-কৃষ্ণ জানেন। আর জানে ঘোড়াটা।"

"ঘোড়া?"

"ভীমকুমারের পেয়ারের ঘোড়া। বাঁধা রয়েছে চত্বরে। পা ঠুকছে। দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করছে। খুনীকে নিশ্চয় দেখেছে।"

উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ—"আমরা সেখানে যেতে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে। দাঁড়ান কলাগুলো খেয়ে নিই। আমিও যাব। দেখি যদি কিছু ক্লু বের করতে পারি।"

অট্টহাস্য করলেন বিক্রম খান। গাধার হাসি—সে এক অপূর্ব আওয়াজ।

শহরের বাইরে ঘন গাছপালার মধ্যে কয়েক বিঘে জমি উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। লোহার গেটের ওপর সাইন বোর্ডে লেখাঃ জগন্নাথ ফিশারিজ সিন্ডিকেট। ইংরেজি নাম। রোদে জলে প্রায় ফিকে হয়ে এসেছে।

গেট বন্ধ করে টুলে বসেছিল দুজন চৌকিদার। বিক্রম খানের জীপ এসে দাঁড়াতেই খুলে দিল ফটক। জীপ ঢুকল ভেতরে।

মস্ত কম্পাউন্ড। চারদিকে ছড়ানো কাঠের বাক্স। মাছের আঁশটে গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে। একটু দূরে একটা দোতলা বাড়ি। ওপরে ঝুল বারান্দা। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন চৌকিদার।

বিক্রম খানের বিরাট গতর ভূতলে অবতীর্ণ হতেই বারান্দায় দাঁড়িয়েই স্যালুট ঠুকল এই চৌকিদার।

নিচ থেকেই হাঁক দিলেন বিক্রম খান—"ডেডবডি কোথায়?"

হাতের ইঙ্গিতে বারান্দার ঘরের ভেতর দেখিয়ে কি যেন বলল চৌকিদার—স্পষ্ট শোনা গেল না।

বিক্রম খান বললেন—"চলুন।"

যাকে বললেন, সে তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে দোতলা বাড়ির পাশের দিকে। সেখানে একটা টিনের চালার তলায় আস্তাবলে পা ঠুকছে একটা মিশমিশে কালো ঘোড়া। ঘাড় বেঁকিয়ে, কেশর ফুলিয়ে ঝাঁকুনি মারছে গলার দড়িতে। পিঠের সাজ পিঠেই রয়েছে।

ইন্দ্রনাথ একদৃষ্টে দেখছে এই সুন্দর ভয়ঙ্করকে। এরই পদাঘাতে গতরাতে ছিটকে পড়তে হয়েছিল। তপতীকে পিঠে নিয়ে এই ঘোড়াই ধেয়ে এসেছে এখানে। এখন মনিব নেই। তাই সে অস্থির—বড় অস্থির...

দোতলার ঘরে ওরা এখন দাঁড়িয়ে আছে।

বড় ঘর। মস্ত খাটখানা ঘরের ঠিক মাঝখানে। উত্তর আর দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে দুটো বিশাল বেলজিয়ান মুকুর—মেঝে থেকে কড়িকাঠ পর্যন্ত। খাটের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলার বাদশাহি ব্যবস্থা।

পুব আর পশ্চিমে ঝুল বারান্দা আর দুটো করে জানলা। সব জানলাই খোলা। পুবের রোদ আসছে জানলা দিয়ে, পড়েছে মেঝেতে—কার্পেটের ওপর।

লোমশ বক্ষ বীভৎস বডিটা পড়ে রয়েছে এই কার্পেটেই। প্রায় উলঙ্গ—পরনের লুঙ্গি হাঁটু পর্যন্ত উঠে রয়েছে। দু'হাত দু'পাশে ছড়ানো। রক্ত যেখানে সবচেয়ে বেশি ভিজিয়েছে দামি কার্পেটটাকে, সেইখানেই থাকার কথা তার মুণ্ড।

কিন্তু নেই।

মুণ্ড নেই কোথাও।

যত রক্ত এই কার্পেটের ওপরেই—তার বাইরে একটা ফোঁটাও পড়েনি।

দোতলায় উঠতে বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়েছে বিক্রম খানকে। হাপরের মতো হাঁপাচ্ছেন। রক্তচক্ষু মেলে রক্তময় কার্পেটের

দিকে তিনিও তাকিয়ে রয়েছেন।

ইন্দ্রনাথ কিন্তু দেখছে কার্পেটের চারদিক। বললে আপন মনে—"রক্তের ফোঁটা কার্পেটের বাইরে পড়েনি কেন?"

হুস হাস করে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বিক্রম খান বললেন—"কাপড়ে মুড়ে নিয়ে গেছে বলে।"

"ঠিক।—কোম্পানীর লোকজন কোথায়?"

"সব পালিয়েছে।"

"আপনি খবর পেলেন কি করে?"

"উড়ো টেলিফোনে। ভোরের দিকে ফোনটা এল। বিচ্ছিরি হেসে একটা লোক বললে—ভীমকুমারের বডিখানা উপহার দিয়ে গেলাম—মুণ্ডুখানা নিয়ে যাচ্ছি গেণ্ডুয়া খেলার জন্যে।—হারামজাদা!"

"আপনি আসেননি?"

"পাগল! কাকে কান নিয়ে গেছে বললেই দৌড়োবো? আমার তখন টয়লেটে যাওয়ার সময়। লোক পাঠালাম। জানলাম, ইয়ার্কি মারা হয়নি টেলিফোনে। নাটের গুরুই খুন হয়েছে।"

"নাটের গুরু! ভীমকুমার?"

"আঁচ করেছিলাম আগেই। প্রমাণ পাচ্ছিলাম না। মালিক যাকে সাজিয়েছিল—আসলে সে ওর মাইনে করা ম্যানেজার। নিজে চালাত লরী। শয়তান! নোট জাল! ধর্মের কল বাতাসে নড়ে!"

কবন্ধের দিকে তাকিয়েই কথাগুলো বলে গেলেন বিক্রম খান। এখন আর তিনি ততটা হাঁফাচ্ছেন না। তাই এত কথা বলতে পারলেন।

"কার্পেটসুদ্ধু বডিটা নিচে নামিয়ে রাখলে হয় না?" ইন্দ্রনাথের প্রস্তাব।

"কি দরকার?" বিক্রম খানের কৌতূহল।

"কতবার সিঁড়ি ভাঙবেন? কষ্ট হচ্ছে তো আপনার।"

"তা ঠিক। ডাক্তার-ফাক্তার এল বলে। বার বার ওপরে ওঠা....এই কে আছিস...."

একটু পরেই কার্পেটসুদ্ধু কবন্ধকে শোয়ানো হলো একতলার দাওয়ায়। এখান থেকে আস্তাবল দেখা যায়। কালো মেঘের মতন কেশর ঝাঁকিয়ে পা ঠুকে চলেছে কালো ঘোড়া। বড় অশান্ত। বড় দুর্দান্ত।

"শয়তানের বাহন শয়তানই হয়," বাইসন-গোঁফে তা দিয়ে বললেন বিক্রম খান। কটমটে চোখে তিনি দেখছেন কালো ঘোড়ার ছটফটানি।

ইন্দ্রনাথও দেখছিল সেই দৃশ্য। শুনছিল চাপা গজরানি। ঘন ঘন দড়িতে টান দিচ্ছে ভয়ঙ্কর সুন্দর। এই বাঁধন তার সইছে না।

ধীর কণ্ঠে বললে ইন্দ্রনাথ—"মিঃ খান, আমার একটা কথা রাখবেন?"

"কথাটা আগে শুনি।"

"ঘোড়া ছেড়ে দিন।"

"ভাবার চাট খাওয়ার শখ হয়েছে?"

"দেখা যাক।"

বাইসন-গোঁফের প্রান্তদেশে মোচড় দিতে দিতে ইন্দ্রনাথের চোখে চোখে চেয়ে রইলেন বিক্রম খান। ধীরে ধীরে আলোর ফুলকি দেখা দিল তাঁর গহন গভীর চাহনিতে।

বললেন—"ব্র্যাভো! ব্রিলিয়ান্ট! গুড আইডিয়া!"

বাঁধন খোলা পেয়েই হ্রেষারবে প্রাঙ্গণ কাঁপিয়ে কালো ঘোড়া তীর বেগে ধেয়ে গেল খোলা ফটকের দিকে। বাইরের চৌকিদার দু'জন তাই দেখেই টেনে বন্ধ করে দিল পাল্লা।

শিরপা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে কালো চতুষ্পদ। রোদে ঝকঝক করছে তার চেকনাই বপু। পরক্ষণেই সামনের দু'পা নেমে এল মাটিতে। ঘুরে দাঁড়াল বিদ্যুৎবেগে এবং যেন উড়ে গেল পশ্চিমের পাঁচিলের দিকে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই লম্বা লাফ মেরে টপকে গেল উঁচু পাঁচিল। দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল অশ্বখুরধ্বনি।

নিমেষে জীপের দিকে ছিটকে গেছে ইন্দ্রনাথ। বিস্ময়কর বেগে ধাবিত হয়েছেন বিক্রম খান। অবিচল আগেই উঠে বসেছিল ভেতরে। সে বুঝেছে, কি খেলা খেলে গেল ধুরন্ধর ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

ইঞ্জিন চালু করে দিয়েছে ড্রাইভার। খুলে গেছে লোহার ফটক। ভীমবেগে জীপ বেরিয়ে গেল বাইরে।

ছুটল সেইদিকে—যে দিকে উধাও হয়েছে কালো ঘোড়া—কক্ষচ্যুত উল্কার মতন।

॥ ৫ ॥

মন্দির রহস্য

গমগম করছে কল্যাণেশ্বরী মন্দির।

ন'শ বছরের প্রাচীন মন্দির। চারিদিকে বড় বড় বটগাছ। আর বালির টিপি। বিরাটকায় হনুমানের দল নির্ভয়ে বিচরণ করছে টিপির ওপর, গাছ থেকে নেমে আসছে জটা বেয়ে। লাইন দিয়ে বসে থাকা ভিখিরীদের পয়সার দিকে তাদের নজর নেই। পুণ্যার্থীরা এলেই ঘিরে ধরছে। তাদের হাত থেকেই কলা কেড়ে নিয়ে ফের উঠে যাচ্ছে গাছে।

প্রাচীন এই মন্দিরের সামনে মস্ত পুকুর। দুদিকের ঘাটে কেউ স্নান করছে, কেউ পা ধুচ্ছে। এই পুকুরের জল পবিত্র। দেহ আর মনের ময়লা সাফ করে দেয়। তারপর ঢুকতে হয় মন্দিরে।

অসংখ্য সাধু গিজগিজ করছে মন্দিরের চওড়া সিঁড়ির ওপর। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। কাপালিকের মতন আকৃতি প্রত্যেকেরই। কপালে লাল সিঁদুরের লম্বা দাগ, গাল চিবুক ঢাকা কালো দাড়িতে, পরনে রক্তবস্ত্র। এদের চাহনিও তীব্র, লোহিত, বুককাঁপানো।

এরাই এই মন্দিরের পাণ্ডা। বিগ্রহ দর্শন, পুজো দেওয়া—এদের মাধ্যমেই সারতে হয়। এইটাই রীতি।

জাগ্রতা দেবীর দর্শন পেতে টাকাপয়সার কার্পণ্য করে না কেউই। তাই দিনান্তে বিগ্রহের সামনে জমা হয় হাজার দশেক টাকার খুচরো আর নোট। পাণ্ডাদের দক্ষিণা এই হিসেবে ধরা হয়নি।

রাস্তা কাঁপিয়ে কালো ঘোড়া ধেয়ে গেছিল এই মন্দিরের দিকেই। শহরে ঢোকেনি। পিচের রাস্তার পাশ দিয়ে ঘাসে ছাওয়া পটিতে

খুরের দাগ ফেলে টগবগিয়ে উধাও হয়েছিল দেবী কল্যাণেশ্বরীর অমোঘ আকর্ষণে।

নক্ষত্রবেগে জীপ ছুটেছিল এই রাস্তা বেয়ে। ঘাসের পটিতে খুরের ছাপ দেখতে দেখতেই ড্রাইভার জীপ চালাচ্ছে। শহরকে পাক দিয়ে রাস্তা এক জায়গায় এসে দুদিকে চলে গেছে।

ঘোড়ার পায়ের ছাপ কিন্তু ধরেছে মন্দিরে যাওয়ার পথ। এতক্ষণ গম্ভীর বদনে চুরুট টেনে যাচ্ছিলেন বিক্রম খান। অবিচল আর ইন্দ্রনাথও নিশ্চুপ।

জীপ কল্যাণেশ্বরীর পথে বাঁক নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চুরুট নামালেন বিক্রম খান। বললেন কল্যাণেশ্বরীর কাহিনী।

পাদটীকায় জুড়ে দিলেন তাঁর নিজস্ব মন্তব্য।

পুলিশ বহুদিন ধরেই এই মন্দিরের দিকে নজর রেখেছে। সারাদিন যারা রক্তবস্ত্র পরে পাণ্ডাগিরি করে, রাতের আঁধারে তাদের অন্য মূর্তি দেখা যায়। তখন তাদের পরনে থাকে না কাপালিকের পোশাক—হাতে চলে আসে আগ্নেয়াস্ত্র। পুজো দিতে যে মেয়েরা আসে—তাদের মধ্যে কিছু সুন্দরীকে রাত কাটিয়ে যেতে হয় মন্দিরে—ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

ধর্মস্থানে এই অধর্ম রোধ করতে পারেনি পুলিশ—কিন্তু খবর রেখেছে চর মারফৎ।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কাপালিকদের চোখেই প্রথম ধরা পড়েছিল কালো ঘোড়ার আবির্ভাব দৃশ্য। আগে শোনা গেছিল দূরায়ত অশ্বখুরধ্বনি। এ-আওয়াজের সঙ্গে তারা পরিচিত। তাই সচকিত চাহনি নিক্ষেপ করেছিল সেইদিকে।

তারপরেই দেখা গেল, বালি উড়িয়ে ধেয়ে আসছে ঘর্মাক্ত ঘোড়া। রোদে চকচক করছে তার কৃষ্ণ বপু।

এইটুকু দেখেই কাপালিকদের একজন পেছন ফিরেই ঢুকে গেছিল মন্দিরের মধ্যে। সেখানে বিদ্যুৎবাতি জ্বলে না। ন'শ বছর ধরে ছমছমে পরিবেশ বজায় রাখা হয়েছে মশালের আলোয়। দাউ দাউ করে দুটো মশাল জ্বলছে দু'দিকে—ধোঁয়ায় কালো দেওয়াল। সারি সারি বিরাট কুলুঙ্গিগুলোর ভেতরে সে আলো ঢুকছে না। তাই ভেতরে কি আছে দেখা যাচ্ছে না। একটা কুলুঙ্গি রয়েছে বিগ্রহের পেছনকার সুড়ঙ্গের মধ্যে।

এখানে কেউ নেই।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে লাফিয়ে কুলুঙ্গির ওপর উঠে গেল কাপালিক। তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

মন্দিরের নিচে পাতালঘরে সেই মুহূর্তে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তপতী। এক হাতে ধরে রয়েছে একটা মরচে ধরা ত্রিশূল। এই হাতের আঙুলে ঝিকমিক করছে সোনা আর টেরাকোটায় মেশানো আংটি। প্রলয় চলেছে পীবর বুকে। হলুদ রঙের হাফ-হাতা কুর্তা অর্ধেক ছিঁড়ে ঝুলছে—নেকলেশ বেঁকে গিয়েও উঠছে আর নামছে ভলক্যানো বুকের দামালিপনায়।

তপতীর সামনে দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে লোমশবক্ষ এক পুরুষমূর্তি। তার চৌকো চোয়াল আর বাঁকা নাক দেখেই পাঠক তাকে চিনে ফেলেছেন।

হ্যাঁ, এই সেই ভীমকুমার।

এখন তার চৌকো চোয়াল চোখা পাথরের মতো শক্ত আর ধারালো। শাণিত চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক। আদিম এই চাহনি লেহন করে যাচ্ছে তপতীর দামাল বক্ষদেশ।

ভীমকুমারের ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ অনাবৃত। তাই তার লোমশ বুক দেখছেন পাঠক। কবন্ধ দেহের বুকেও ছিল এইরকম লোম।

এক হাতে মদের বোতল, আর এক হাত কোমরে। ভীমকুমার বলছে স্খলিত কণ্ঠে—"পিয়ারি, বিয়ে তো হবেই—পুরুৎ এল বলে। তার আগে এস—এক ঢোক হয়ে যাক।"

তপতী নিরুত্তর। সে ভয় পায়নি। তার চোখ বলে দিচ্ছে দেবী কল্যাণেশ্বরী স্বয়ং যেন তার ওপর ভর করেছেন। ধকধক করছে দুই চোখ। গোটা শরীরটা যেন আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎ।

গর্জে উঠে ভীমকুমার—"মট করে ভেঙে দেব তেজ। গলা কেটেছি ম্যানেজারের—কাটব তোরও—চলে আয়—ফেলে দে ত্রিশূল।"

ঠিক ওই সময়ে ধাক্কা পড়ল দরজায়।

"কে?" তপতীর দিকে পেছন না ফিরেই হেঁকে ওঠে ভীমকুমার।

"রাজা ফিরে এসেছে," কণ্ঠস্বর ভেসে এল দরজার ওপার থেকে।

নিমেষে যেন দুটো তারকার বিস্ফোরণ ঘটে গেল ভীমকুমারের দুই চোখের মণিকায়। ক্রূর হাসি ভেসে গেল ঠোঁটের ওপর দিয়ে।

বললে গলা তুলে—"বড় তাড়াতাড়ি এল যে! পেছনে পুলিশ আসছে কি?"

"এখনও খবর আসেনি।"

"তোরা তৈরি?"

"হ্যাঁ।"

"গাড়িতে ইলেকট্রনিক ডিটোনেটর তুলেছিস?"

"হ্যাঁ।"

"উঠে পড়। আমি আসছি।"

ইলেকট্রনিক ডিটোনেটর! পুলিশ! মুহূর্তের জন্যে উন্মনা হয়েছিল তপতী।

আর এই সুযোগটুকুর জন্যেই ওর চোখে চোখ রেখে কথা বলে যাচ্ছিল ভীমকুমার।

আচমকা কোমরে রাখা হাতখানা ঘুরে গিয়ে ত্রিশূল চেপে ধরে মুচড়ে এনে ছুঁড়ে দিল ঘরের কোণে—নিক্ষিপ্ত হলো হাতের বোতলও। দুই সবল হাতে তপতীকে শূন্যে তুলে নিয়ে ধবধবে চাদর পাতা খাটের দিকে অগ্রসর হলো ভীমকুমার....

মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে পা ঠুকছে কালো ঘোড়া। কেউ তাকে ধরে নেই। দূরে দূরে দাঁড়িয়ে কয়েকশ মানুষ অবাক চোখে তাকিয়ে সেদিকে।

পুলিশ জীপ দাঁড়িয়ে অনেকদূরে। কেউ নামেনি জীপ থেকে।

ইন্দ্রনাথই নামতে দেয়নি। জীপকেও আর এগোতে দেয়নি।

শুধু বলেছিল—"আর এগোবেন না।"

"কেন?" বিক্রম খানের প্রশ্ন।

"ফাঁদে পা দিতে চান?"

"মানে?"

"ভীমকুমার যে খুন হয়নি—এখন নিশ্চয় তা বুঝেছেন?"

"আপনার দৌলতে বুঝেছি।"

"ধন্যবাদ।—ভীমকুমারের ঘোড়া ভীমকুমার যেখানে— সেইদিকেই ছুটেছে—কবন্ধ দেহের দিকে যায়নি।"

"তা তো দেখলাম। এখন এগোবো না কেন? ভীমকুমারের ঘোড়া আর দৌড়োচ্ছে না—তার মানে রাস্কেলটা ওখানেই আছে।"

"ভীমকুমার কি জানত না, ঘোড়া তার পেছনে আসবেই?"

"অ্যাঁ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। জানত বলেই ঘোড়াকে রেখে এসেছিল সবার সামনে। যাতে আমরা ছেড়ে দিই, তার পেছনে আসি, তারপর...."

"তারপর?"

জবাব না দিয়ে মন্দিরের পেছনের জঙ্গলের দিকে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ—"ওদিকে রাস্তা আছে?"

"বনের রাস্তা—লোকজন যায় না।"

"আমরা যেতে পারি?"

আবার গভীর গহন চাহনি ফিরে এল বিক্রম খানের চোখে।

বললেন চিবিয়ে চিবিয়ে—"ব্র্যাভো! ব্রিলিয়ান্ট! গুড আইডিয়া!"

কিন্তু চত্বর পাক দিয়ে, পুকুরের ওপাশ দিয়ে, মন্দিরের পেছনে পৌঁছোনোর আগেই অজ্ঞান তপতীকে কাঁধে নিয়ে ঢাকা-লরীতে উঠে পড়েছিল ভীমকুমার। সঙ্গে চার কাপালিক। একজন বসল ড্রাইভারের আসনে। একজন বসল তার পাশে। এর হাতে সরু পেন্সিলের মতন একটা বস্তু। ইলেকট্রনিক টাইম ডিটোনেটর।

ভীমকুমার বসেছে ঢাকা লরীর ভেতরে। ওর পায়ের কাছে শুয়ে আছে তপতী। জ্ঞান নেই। ক্লোরোফর্মের এফেক্ট বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

বিয়েটা তার পরেই হবে'খন। আশপাশে সাজানো রাশি রাশি বাক্সর ওপর চোখ বুলিয়ে নেয় ভীমকুমার।

চাপা গলায় বললে ড্রাইভার কাপালিককে—"হ্যান্ড গ্রেনেড কটা আছে?"

"দু'শ।"

"এ-কে ফিফটি সিক্স?"

"পঞ্চাশ।"

"কালো সাবান?"

"ছ-বাক্স।"

আবার সেই কুটিল হাসি ভেসে ওঠে ভীমকুমারের ঠোঁটের ওপর। বিড়বিড় করে বললে আপন মনে—"কালো সাবান! খেল দেখিয়ে ছাড়বে এখুনি।" একটু গলা তুলে—"মন্দিরের চার দেওয়ালে লাগিয়েছিস তো?"

"ইয়েস বস। থেবড়ে দিয়েছি। বম্বের এক্সপ্লোশনও হার মেনে যাবে।"

"ছাপাখানার ভেতরে?"

"মেশিন, নোট—কিচ্ছু আস্ত পাবে না।—বস।"

"কিরে?"

"হাওড়া ব্রীজটা ওড়াবো কবে?"

"মালপত্র নিয়ে যাচ্ছি তো ওই জন্যেই। টাকা খেয়েছি—কাজ করবই।—কে আসে?"

জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসছে এক কাপালিক।

পুলিশ ড্রাইভারের ইচ্ছে হয়েছিল জীপটার ইঞ্জিন চালু করার। হনুমানের আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গেছিল। চারদিকে ছেঁকে ধরেছিল। তাই ইঞ্জিন চালু করেছিল ভয় দেখানোর জন্যে। গোঁ গোঁ আওয়াজ বাড়িয়েছিল আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যে।

সেই আওয়াজ গিয়ে পৌঁছেছিল মন্দিরে। পাণ্ডাদের একজন কানখাড়া করে তাকাচ্ছিল ইতিউতি। আওয়াজ শুনেই সে চেয়েছিল সেইদিকে। জঙ্গলের মধ্যে জীপ চিনতে তার দেরি হয়নি।

সঙ্গে সঙ্গে দৌড়েছিল মন্দিরের পেছনে...

বললে হাঁপাতে হাঁপাতে—"এসে গেছে।"

"পুলিশ?" ভীমকুমারের প্রশ্ন।

"হ্যাঁ। জঙ্গলের মধ্যে ঘাপটি মেরে রয়েছে।"

"উঠে আয়। চালাও পানসি।"

উড়ে গেল লরীটা।

দাঁতে দাঁত পিষে ভীমকুমার বললে—"লক্ষ্মণ, ঠিক পনেরো মিনিট পরে রিমোট কন্ট্রোল করবি। ওদের ঢুকতে দে ভেতরে।"

ওরা কিন্তু ঢোকেনি। পনেরো মিনিটও যায়নি—লরীর আওয়াজ পেয়েই হুড়মুড় করে দৌড়ে এসেছিল ইন্দ্রনাথ, অবিচল আর বিক্রম খান।

মেঝের দিকে আঙুল নামিয়ে বলেছিল ইন্দ্রনাথ—"কি দেখছেন?"

"মোবিল।"

"গাড়ি এখানেই দাঁড়িয়েছিল। মালপত্র নিশ্চয় তাতেই গেছে। ভীমকুমার আর তপতীও। অবিচল, মিঃ খান—চলুন—জীপে ফিরে যাই।"

"মন্দিরে ঢুকবো না?"

"না।"

"দূর মশায়। পাখি যখন উড়ে গেল—ঢুকতে ক্ষতি কী?"

"লাভও কিছু নেই। পাখির পেছনে ধাওয়া করলেই বরং লাভ।"

"মন্দ বলেননি।"

সত্যি মন্দ বলেনি ইন্দ্রনাথ। জীপে ফিরে গিয়ে ঘুরপথে লরীর পেছন নিতে নিতেই কেটে গেছিল পনেরো মিনিট।

ধাবমান লরীর ভেতর বসে ভীমকুমার শুধু বলেছিল—"চার্জ।"

ছ'কিলোমিটার পেছনে উড়ে গেছিল গোটা কল্যাণেশ্বরী মন্দির। অ্যাটমবোমা ফাটলে এরকম ব্যাঙের ছাতার মতন ধোঁয়া ধেয়ে যায় মেঘলোক লক্ষ্য করে।

নিশ্চিহ্ন হয়েছিল নোটজালের কারখানা। ছিন্নভিন্ন হয়েছিল অসংখ্য মানুষ।

সে আর এক কাহিনী। আমরা যাই চলুন ভীমকুমারের পেছনে।

বিস্ফোরণের আওয়াজ পৌঁছেছিল দশ

কিলোমিটার দূরে—রেশ ধেয়ে গেছিল আরও দূরে।

পুলিশ আউটপোস্ট থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এসেছিল প্রহরী। বিস্ফারিত চোখে দেখেছিল মেঘলোকের দিকে ঠিকরে যাওয়া কালো ধোঁয়া।

আর ঠিক সেইসময়ে দেখা গেল ঝড়ের মতো একটা লরী ছুটে আসছে...

আসছে মন্দিরের দিক থেকেই—যেদিকে এখুনি ঘটেছে বিস্ফোরণ...

"হল্ট।" প্রহরী তার কাজ করেছে। গোটা ভারত এখন সজাগ হয়ে গেছে সন্ত্রাসবাদীদের কাজ দেখে। বোম্বাই, কলকাতা—এবার না জানি খাঁড়া নেমে আসে কার মাথায়।

তাই হাত তুলেছিল প্রহরী। সামনেই ব্রেক কষেছে লরী। প্রহরী এগিয়ে এসেছে ড্রাইভারের জানলার সামনে...

উপহার পেয়েছে একটা বুলেট। নাইন মিলিমিটার পিস্তলের বুলেট। তেরপলের আড়ালে বসে লক্ষ্য ঠিকই রেখেছিল ভীমকুমার।

প্রহরী পড়ে রইল রাস্তায়। লরী উড়ে গেল সামনে। পিস্তল নামিয়ে রেখে তেরপলের ফাঁক দিয়ে পেছনের আকাশগামী ধূম্রকুণ্ডলীর দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে রইল ভীমকুমার। ঠোঁট শক্ত, চোয়াল কঠিন, চাহনি কিন্তু নির্বিকার। কলেজে পড়েছে, ডিগ্রী নিয়েছে, চাকরি কিন্তু পায়নি। শেষে হয়েছিল সমাজবিরোধী। নোটজাল দিয়ে শুরু—এখন যে জালে জড়িয়েছে, তা ছড়ানো গোটা পৃথিবীতে। টাকার অভাব নেই। কাজ একটাই।

ইন্ডিয়ার বিশেষ বিশেষ জায়গায় প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটানো। দেদার কালো সাবান রয়েছে সঙ্গে—যার সাধুনাম RDX।

কুটিল হাসি ভেসে যায় ভীমকুমারের নির্মম ঠোঁটের ওপর দিয়ে। সময় হলেই চম্পট দেবে ইন্ডিয়া ছেড়ে—সঙ্গে নিয়ে যাবে নতুন বউকে...

তন্ময় হয়ে সুখস্বপ্নে মশগুল হয়েছিল বলেই খেয়াল করেনি কি ঘটে চলেছে ঠিক পেছনেই।

ঘোর কেটে গেছিল ক্লোরোফর্মের। লরীর ঝাঁকুনি আর গজরানিতে চেতনা ফিরে এসেছিল আরও তাড়াতাড়ি। চোখ মেলে চেয়েই তপতী দেখেছিল নাইন মিলিমিটার পিস্তল।

আর দেখেছিল ভীমকুমারের পশ্চাতদেশ। তেরপলের ফাঁকে চোখ রেখে চেয়ে রয়েছে সামনে।

দেবী কল্যাণেশ্বরীর কৃপায় কিনা বলা যাবে না—নিমাই সান্যালের প্রেতাত্মার কারসাজিও হতে পারে—তপতী যেন আর তপতী রইল না সেই মুহূর্তে। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল পিস্তল। আঙুল রাখল ট্রিগারে। নল রইল ভীমকুমারের মাথার পেছনে।

পিস্তল নির্ঘোষ শুনেই চমকে উঠেছিল ড্রাইভার আর তার সঙ্গীরা। খুপরির ভেতরে চোখ রাখবার আগেই খুপরি দিয়ে এগিয়ে এসেছিল নাইন মিলিমিটারের নলচে।

ভেসে এসেছিল তীক্ষ্ণ বামাকণ্ঠ—"গাড়ি দাঁড় করাও।'

গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। কেবিনের সব কটা মূর্তিমানকে পিস্তলের হুমকি দিয়ে কাঠের মতন বসিয়ে রেখেছিল একা তপতী। আঙুল নাড়তেও দেয়নি।

আর তারপরেই এসে গেল পুলিশ জীপ।

কাহিনীর শেষ দৃশ্যটা বড় মধুর।

অবিচলের বুকে মাথা রেখে কাঁদছে তপতী।

কাঁদুক। জঙ্গল ওদের ঘিরে রাখুক।

চলুন আমরা পালাই।

আপনার মনে একটা প্রশ্ন খচখচ করছে? সংখ্যার হেঁয়ালি তো? কেন লরীর নম্বর পালটাত ভীমকুমার? চার হতো তিন, এক হতো চার—এই তো?

সমাধানটা ইন্দ্রনাথই মাথা খাটিয়ে উপহার দিয়েছিল বিক্রম খানকে। শেষ দৃশ্যের অনেক পরের দৃশ্যে দেখা গেছিল কাষ্ঠাসনে বসে ফের নুন-মরিচ মাখানো কলা খাচ্ছেন ভদ্রলোক—বাঁ হাতে বাইসন-গোঁফে তা দিচ্ছেন।

আপনার মতো তিনিও এইমাত্র সংখ্যার হেঁয়ালির সমাধান যাচ্ঞা করেছেন ইন্দ্রনাথের কাছে। গোয়েন্দাপ্রবর এখন একাই বসে রয়েছে। ওর চ্যালা এই মুহূর্তে সমুদ্রে নেমেছে প্রেয়সীকে নিয়ে।

ছোট্ট জবাব দিয়েছিল ইন্দ্রনাথ—

"আপনার চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে।"

"মা-মানে?"

"আপনি যে ওর ওপর নজর রেখেছেন, নিশ্চয় তা আঁচ করেছিল। খবর তো নেবেন অফিসের গেটকীপার আর জঙ্গলের ডেরার লোকজনের কাছ থেকে। একই নম্বরের লরী নিয়মিত দু'জায়গায় যাতায়াত করছে—এটা গেটকীপারের লগবুকে কিন্তু লেখা হচ্ছে না—জঙ্গলের ডেরাতেও লোকজন দেখছে—চালক এক হতে পারে—কিন্তু লরী আলাদা। ধোঁকায় পড়েননি আপনি?"

"হেঁ হেঁ হেঁ।"

"কিন্তু এই অতি-হুঁশিয়ারিই কাল হলো। অবিচলের সন্দেহ হলো। ফলটা—"

কি হলো, আমরা জানি। অতএব কাহিনী এখানেই সমাপ্ত।

ছবি: ধ্রুব রায়